Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা খাতুন

রোলঃ 227022309

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আমেনা খাতুন

রোলঃ 227022309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কারবালার ইতিহাস ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমেনা খাতুন, আইডিঃ 227022309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আমেনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আমেনা খাতুন

আইডিঃ 227022309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

হযরত আলী (রাঃ) হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংক্ষিপ্ত বিবরণ 7

খেলাফতে রাশেদার উত্থান ও পতন 8

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল ও রাজনীতি: 8

ইমাম হুসাইন (রা) 11

হযরত ইমাম হাসানের (রা) খিলাফত 14

ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার রাজনীতি 15

ইরাক থেকে গণ আমন্ত্রণ 18

মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ: 25

কারবালার প্রান্তরে হুসাইন-এর শাহাদাত বরণ করার প্রকৃত ঘটনা 26

মৃতদেহ পিষ্ট করা 29

নিহতদের এবং শহীদগণের সংখ্যা: 29

হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের কর্তিত শির ইবনে যিয়াদের দরবারে 29

বাকী আহলে বাইতগণের কুফায় আগমন ও ইবনে যিয়াদের সাথে কথোপকথন 30

হযরত হোসাইন (রা)-এর পবিত্র শির ইয়াযীদের কাছে প্রেরণ 32

ইয়াযীদের ঘরে মৃত্যু শোক 33

ইয়াযীদের দরবারে যয়নব (রা)-এর বীরত্ব ব্যঞ্জক বক্তব্য: 34

ইয়াযীদের গৃহে আহলে বাইতের মহিলাগণ 34

ইয়াযীদের সামনে আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ) 34

আহলে বাইতগণের মদীনায় প্রত্যাবর্তন 36

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্ত্রীর পেরেশানী ও ইন্তেকাল 37

আবদুল্লাহ বিন জাফরকে সমবেদনা জ্ঞাপন 37

হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতে প্রকৃতির পরিবর্তন 38

শাহাদতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্নে দেখা 38
হযরত হোসাইন (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদ্য 39
হযরত হোসাইন (রা)-এর অমূল্য উপদেশ: 40
হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের বিভীষিকাময় পরিণাম 40
হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীর অন্ধ হওয়া 42
মুখ কালো হয়ে যাওয়া 42
আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে যাওয়া 42
পানি পানে বাধা প্রদানকারীর করুণ মৃত্যু 43
ইয়াযীদের লাঞ্ছনাময় মৃত্যু 43
কুফায় মুখতারের কর্তৃত্ব এবং হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের করুণ মৃত্যু 43
অমঙ্গল ও জঘন্য প্রাসাদ 45
জ্ঞানীগণ উপদেশ 46
হযরত হোসাইন (রা)-এর আদর্শ 46
যে উদ্দেশ্যে হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছেন 47
উপসংহার 48
গ্রন্থপুনিজ 48

ভূমিকা

কারবালার ইতিহাস অত্যান্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। এ কারবালার ঘটনার মধ্যে রয়েছে গোটা মুসলমানের জন্য এক মহান শিক্ষা। বিশেষ করে কারবালার শাহাদাতের ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীগণ কারবালা প্রান্তরে যে শাহাদাত বরণ করেছেন, তা গোটা মুসলিম জাতির জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা। কেননা

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ "

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
হাসান ও হুসাইন (রা.) প্রত্যেকেই জান্নাতি যুবকদের সর্দার। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬৮)

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান চালু করা, খেলাফতে নববীর ধারাবাহিকতা জারী রাখা এবং ইসলামী ইনসাফ কায়েম করার জন্যই হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীগণ শাহাদত বরণ করেছেন। এই শাহাদত ছিল, অত্যন্ত করুণ ও ব্যথাতুর। এই নিষ্ঠুর ঘটনার কথা স্মরণ করলেও প্রতিটি মানুষের অন্তর শিউরে ওঠে। হযরত হোসাইনের (রা) এই শাহাদতের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের জন্য এক দিক নির্দেশনা।
হযরত হোসাইন (রা) জানতেন যে, এজিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেই তিনি ও তাঁর সাথীগণ প্রাণে রক্ষা পাবেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি পার্থিব সম্পদের অনেক মালিক হবেন। পাবেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মান। কিন্তু তিনি এই সবগুলো সত্যের মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি চিন্তা করলেন, আজ যদি আমি পার্থিব সম্পদের মোহে ঢলে পড়ি, তবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। খেলাফতে নববীর পরিবর্তে এসে যাবে বাদশাহী ও আমিরী খেলাফত। না, তা হতে পারে না, আমার প্রাণ যাবে তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে আমার সামনে মুছে যেতে দেব না। তিনি' কোন জনবলের চিন্তা করলেন না, কোন শক্তির পরোয়া করলেন না, একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে দুশমনদের মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করলেন। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর শাহাদতের মাধ্যমে গোটা মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন যে, মুমিন কোনদিন জয়-পরাজয়ের' চিন্তা করে না, পরোয়া করে না কোন শক্তির। সে অন্যায়ের মোকাবিলায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ঝাপিয়ে পড়ে। পরিণাম আল্লাহর কুদরতি হাতে যা হবে, তাতেই মুমিন খুশী থাকবে ও আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

কারবালার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সামগ্রীক জনমতকে অগ্রাহ্য করে গুটি কয়েক লোকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খেলাফতের পতন ঘটিয়ে যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা) প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে হিজরী ৬১ সালের ১০ই মহররম কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা) এর শাহাদাত বরন করেন । মূলত এ দিনটি ইসলামে আশুরার দিন হিসেবেও পরিচিত। পূর্ব থেকেই এ দিনে রোজা রাখা হতো। আশুরার রোজা রাখার ফজিলত অনেক বেশি। এ দিনের রোজা রাখার ফজিলত বর্ণনায়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি বিগত এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।' (মুসলিম)

কিন্তু এ দিনটিকে কেউ কেউ শুধু কারবালার মাতক ও শোকানুষ্ঠান হিসেবে উদযাপন করে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় নাতি হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়বিদারক শাহাদাত দিবস হিসেবে শরীরে আঘাত করতে থাকে; শরীর রক্তাক্ত করতে থাকে; তাজিয়া মিছিল তথা যুদ্ধের সাজ সাজ পোশাকে ঘোড়া সাজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে; হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কৃত্রিম মাজার তৈরি করে রাস্তায় প্রদর্শণীতে নেমে পড়ে; আশুরা উপলক্ষ্যে এসব আয়োজন ও আমল বর্জন করা আবশ্যক। এ সব আমলের ব্যাপারে ইসলামের কোনো অনুমোদনই নেই।

তবে এদিন ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্মরণে তার জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা হতে পারে। কারবালার প্রান্তরে শাহাদাতবরণকারীদর জন্য দোয়ার অনুষ্ঠানও করা যেতে পারে। ইসলামের বিজয়ের জন্য তাদের ত্যাগ ও অবদান তুলে ধরতে হবে। কেননা মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা দোষণীয় নয়।

হযরত আলী (রাঃ) হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইসলামে চতুর্থ খোলাফায়ে রাশেদীন আলী ইবনে আবি তালিবকে, ইবনে মুলজিম নামে একজন খারেজী ৬৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত কুফার শাহী মসজিদে হত্যা্ করেন।৬৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ইবনে মুজলিম বিষাক্ত বিষে মাখা একটি তলোয়ার দিয়ে হযরত আলীর মাথায় আঘাত করেন এবং এই আঘাতের কারণেই ঘটনার দুইদিন পর ২৮শে জানুয়ারী ৬২ বা ৬৩ বছর বয়সে হযরত আলী শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উমর এবং হযরত উসমানের পর তৃতীয় খলিফা হিসেবে তিনি হত্যাকান্ডের শিকার হন। ৬৫৬ সালে হযরত উসমানের হত্যাকান্ডের পর হযরত আলী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত পান। খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মুয়াবিয়া ১ সহ বিভিন্ন গোত্র তার বিরোধিতা করতে থাকে। ইসলামী শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম ফিতনা নামে একটি সামরিক যুদ্ধ সংগঠিত হয় যা খোলাফায়ে রাশেদীনদের শাসনের ইতি ঘটায় এবং উমাইয়া শাসনের গোড়াপত্তন ঘটায়। ৬৫৬ সালে খলিফা উসমান ইবনে আফফানের হত্যাকান্ডের পর এটি শুরু হয় এবং হযরত আলীর খেলাফতের চার বছরকাল ধরে যুদ্ধটি চলতে থাকে। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী মুয়াবিয়া ১ এর সাথে মধ্যস্থতা করতে রাজী হলে তার দলের কিছু সৈন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে পরবর্তীতে তারা হযরত আলীকে ত্যাগ করেছিল এবং খারেজী নামে পরিচিতি হয়েছিল। তারা হযরত আলীর কিছু সমর্থককে হত্যা করে তবে ৬৫৮ সালে জুলাইয়ে সংগঠিত নাহরাওয়ান যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর সৈন্যরা তাদের ধ্বংস করে দেন । ইবনে মুজলাম মক্কায় আল-বুরাক ইবনে আব্দ আল্লাহ এবং আমর ইবনে বকর আল-তামিমি নামক অন্য দুইজন খারেজীর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুসলমানদের দুর্দশার জন্য আলী, মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনে আসই, মিশরের শাসনকর্তা, দায়ী। নাহরাওয়ান যুদ্ধে তাদের সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ এবং সে সময়কার শোচনীয় অবস্থা নিরসনের জন্য তারা এই তিনজনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হযরত আলীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ইবনে মুলজাম কুফার পথে রওনা হন। সেখানে তিনি এক মহিলার প্রেমে পড়েন যার পিতা এবং ভাই নাহরাওয়ান যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। মহিলাটি এই শর্তে বিয়ে করতে রাজী হয় যে যদি সে হযরত আলী (রাঃ) কে হত্যা করতে পারে তাহলেই সে ইবনে মুজলামকে বিয়ে করবে। ফলস্বরূপ, কুফা শাহী মসজিদে ইবনে মুজলাম হযরত আলীকে ছুরিকাঘাত করেন। হযরত আলীর শাহাদাতের পর, হাসান ইবনে আলী ইবনে মুজলামকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন।

খেলাফতে রাশেদার উত্থান ও পতন

ইমাম হুসাইন (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিনও লেখাফতে রাশেদার পুনর্বহালের কিছু আশা অবশিষ্ট ছিল। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়েই খেলাফতে রাশেদার পতন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হয়।

এই শাহাদাত ও পতনের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, ইমাম হাসানের (রা) সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়ার (রা) পর ইমাম হুসাইন (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা হবেন এই প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্টভাবে দেয়া সত্ত্বেও মুয়াবিয়া (রা) তা লংঘন করেন এবং নিজের পাপাসক্ত, অত্যাচারী, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছেলে ইয়াযীদকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। আর ইয়াযীদ তার অধীনস্থ সকল এলাকার শাসকদেরকে সকলের কাছ থেকে তার আনুগত্যের শপথ (বায়য়াত) আদায় করার নির্দেশ দেয়। যারা আনুগত্যের শপথ নেবেন না, তাদেরকে প্রয়োজনে হত্যা করার জন্যও ইয়াযীদ প্রকারান্তরে নির্দেশ জারী করে। এই জন্যই কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যরা ইমাম হুসাইনকে (রা) বায়য়াত অথবা যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিকল্প গ্রহণের অনুমতি দেয়নি, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল যুদ্ধ ও ইমামের শাহাদাত।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল ও রাজনীতি:

ঐতিহাসিক মুর বলেছেন: "দামেস্কে মুয়াবিয়ার (রা) সিংহাসনে আরোহন খিলাফতের সমাপ্তি ও রাজতন্ত্রের প্রারম্ভ সূচনা করে।" আমীর আলীর মতে "ইমাম হাসানের (রা) পদত্যাগের পর মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের একজন স্বঘোষিত ও কার্যত একচ্ছত্র সম্রাট হলেন।তিনি ছিলেন ধূর্ত, অসৎ, তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, কৃপণ অথচ প্রয়োজনবোধে অস্বাভাবিক উদার এবং যাবতীয় ধর্মীয় কাজে বাহ্যতঃ নিষ্ঠাবান। কিন্তু তার কোন পরিকল্পনা অথবা আকাংখা চরিতার্থ করার পথে কোন মানবীয় বা ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধ বাধা সৃষ্টি করতে পারতোনা।" বস্তুত আরব সীজার নামে খ্যাত মুয়াবিয়া (রা) যদিও প্রথম জীবনে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা) এর ব্যক্তিগত সহকারী ওহি লেখক ও হযরত ওমরের খিলাফতকালে সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে চরম ধূর্ততা, কপটতা ও অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে ইমাম হাসানের (রা) সাথে সম্পাদিত চুক্তির অবমাননা করে নিজের অযোগ্য ও মদ্যপ ছেলে ইয়াযীদকে মুসলিম জাহানের পরবর্তী শাসক ও সম্রাট নিয়োগ করে যান এবং নব্বই বছর ব্যাপী উমাইয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজেই বলতেন, "আমিই প্রথম মুসলিম সম্রাট।"

কোরাইশ বংশের প্রধান দুটো শাখা বনু উমাইয়া ও বনু হাশেম। এই দুটো শাখার মধ্যে আগে থেকেই দ্বন্দ্ব-কলহ ও হিংসা দ্বেষ বিরাজিত ছিল। উভয়ে নিজ নিজ আভিজাত্য নিয়ে

প্রতিযোগিতা করতো। রাসূল (সা) বনুহাশেম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিন জন খলিফা হযরত আবু বকর (রা), ওমর (রা) ও আলী (রা) এই বনু হাশেম শাখা থেকেই হন। একমাত্র হযরত উসমান (রা) ছিলেন বনু উমাইয়া শাখা থেকে। কিন্তু তিনি বনু উমাইয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর আমলে উমাইয়া গোত্রীয় আমীর মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় নিজের মজবুত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং সেখানে উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
বনু হাশেমের নবুয়তের গৌরব অর্জন কোন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলনা। তারা এটা অর্জনের জন্য কোন চেষ্টা সাধনা বা যুদ্ধ করেনি এবং কোন পার্থিব চেষ্টা সাধনা দ্বারা তা অর্জন করাও যায়না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেনঃ "আল্লাহ কাকে নবুয়ত দেবেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন।"" সুতরাং অন্য কোন আরব গোত্রের পক্ষে এই গৌরব অর্জন করে আভিজাত্যে বনুহাশেমের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব ছিলনা। রাসূল (সা) এর নবুয়ত ঘোষণার পর মক্কার সকল নেতা ও সরদার তার বিরোধিতা শুরু করে এবং তার নবুয়তের দাবী ও মিশনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ তাদের সেই চেষ্টাকে সফল হতে দেননি। তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথ রোধ করতে পারেনি। এমনকি আরবের এইসব নেতাকে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছায় হোক-অনিচ্ছায় হোক ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। এই সব নেতা ও সরদারের মধ্যে বনু উমাইয়া শাখার আবু সুফিয়ান ও তার ছেলে আমীর মুয়াবিয়াও ছিলো, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। সাহাবী হিসাবে মর্যাদা লাভ করলেও তারা উভয়ে রাসূল (সা) এর দীর্ঘস্থায়ী সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং সে কারণে ইসলামের মূলশিক্ষা ও 'নৈতিক প্রভাব তাদের অন্তরে ও চরিত্রে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হবার সুযোগ পায়নি।

নিজের অসাধারণ কর্মকুশলতা ও দক্ষতার বলে আমীর মুয়াবিয়া নিজের পথের সকল কাঁটা দূর করতে সক্ষম হন এবং দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে এক নাগাড়ে প্রায় ২০ বছর যাবত শাসন পরিচালনা করেন। নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি নিজের ছেলে ইয়াযীদের স্বপক্ষে আনুগত্যের শপথ আদায় করেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি তার সকল বিরোধীকে পদানত করে ফেলেছেন, সমগ্র আরব তার সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় এসে গেছে এবং তার হুকুম অমান্য করে এমন সাধ্য কারো নেই। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ইয়াযীদের ক্ষমতাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক ও পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন। তাই তার পরে ইয়াজীদকে কারো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবেনা। সে অত্যন্ত সুখে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু এটা ছিল তার কল্পনা বিলাস। এটা ভাবতেও অবাক লাগে, এত বড় ধুরন্ধর ও বিচক্ষণ শাসক হয়েও তিনি কিভাবে এমন অবান্তর কল্পনা বিলাসকে প্রশ্রয় দিতে পারলেন। তিনি নিজে যে দুর্লভ শাসকসুলভ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তার ছেলে ইয়াযীদের ভেতরে তার লেশমাত্রও ছিলনা। সে না ছিল তাঁর মত বুদ্ধিমান, উদার ও দানশীল, না ছিল ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সে দিনরাত খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকতো। সে ছিল একাধারে পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীতিজ্ঞানহীন এবং মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন।

ভন ক্রেমারের ভাষায়:

"মুয়াবিয়ার মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তার অযোগ্য ও পাপাসক্ত ছেলেকে উত্তরাধীকারী মনোনয়ন করা সত্যিই বিস্ময়কর।" তখন যদিও মুসলমান সমাজে অনেক দোষক্রুটি ঢুকে গিয়েছিল; কিন্তু তখনো ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল। রাসূল (সা) এর তিরোধানের পর চল্লিশ বছরও অতিবাতি হয়নি। বহু সুযোগ্য সাহাবী তখনো জীবিত। আমীর মুয়াবিয়া যদিও অন্ধ পিতৃস্নেহবশত চাটুকারদের প্ররোচনায় ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা কখনো তাতে সম্মত ছিলনা। তারা জানতো, খলিফা হবার জন্য কমের পক্ষে

তিনটে গুণ থাকা চাইঃ

১. ইসলামের জ্ঞানের দিক থেকে বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী,

২. উচ্চতর বংশীয় মর্যাদার অধিকারী,

৩. সততা, খোদাভীতি ও নিষ্ঠায় সকল মুসলমানের চেয়ে অগ্রগামী।

কিন্তু ইয়াযীদের ভেতরে দ্বিতীয় গুণটা ছাড়া বাদবাকী দুটো গুণ একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। যখন আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান এবং তাকে নিম্নরূপ ওসিয়ত করেন:

"প্রিয় বৎস! আমি তোমার পথের সব কাঁটা দূর করে দিয়েছি। তোমার শত্রুদেরকে বশীভূত ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছি। আরব জাতির শির তোমার সামনে নত করে দিয়েছি। এত বিপুল সম্পদ রাজকোষে জমা করে দিয়েছি, যার কোন তুলনা হয়না। আমার এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে যে, তুমি হেজাজবাসীর (মক্কা, মদিনা ও তায়েফ অঞ্চল) সাথে কৃপা ও অনুগ্রহের আচরণ করবে। কেননা তারাই তোমার স্ব-বংশীয়। কোন হেজাজবাসী তোমার কাছে এলে তার যত্ন নিও। ইরাকবাসীর প্রতিও নজর দিও। তারা যদি প্রতিদিন একজন নতুন শাসনকর্তা চায়, তবে তাই দিও। কেননা শাসনকর্তাদেরকে বরখাস্ত করা জনগণের বিদ্রোহ ও অসন্তোষের মোকাবিলা করার চেয়ে ভালো। সিরিয়াবাসীর সাথেও সদাচরণ করবে। তাদেরকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে গ্রহণ করবে। শত্রুর দিক থেকে কোন বিপদের আশংকা থাকলে সিরীয়দের সাহায্য নিও। তবে শত্রুকে প্রতিহত করার পর তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ফেরত পাঠিয়ে দিও। কারণ অন্যান্য এলাকায় বাস করলে তাদের স্বভাব চরিত্র বদলে যেতে পারে।"

"মনে রেখ, খিলাফতের ব্যাপারে কুরাইশ বংশের চার ব্যক্তি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেঃ আলীর ছেলে হুসাইন (রা), ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ (রা), যুবাইরের ছেলে আবদুল্লাহ, এবং আবু বকরের ছেলে আবদুর রহমান। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। এবাদত করতে করতে তিনি ক্লান্ত। সবাই যখন আনুগত্যের শপথ করবে, তখন তিনিও করবেন। হুসাইন (রা) সাদাসিধে মানুষ। ইরাকীরা তাকে অবশ্যই তোমার

মোকাবিলায় দাঁড় করাবে। তিনি যদি তোমার মোকাবিলায় এসেই পড়েন এবং তুমি বিজয়ী হও, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিও। কেননা তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং রাসূলুল্লাহর দৌহিত্র। আমাদের ওপর তার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। আবদুর রহমান বিন আবু বকর অপেক্ষাকৃত বিলাসী মানুষ। নিজের আরাম আয়েশের দিকেই তার ঝোক বেশী। সবাইকে যা করতে দেখবেন, উনিও তাই করবেন। তবে যে ব্যক্তি সিংহের মত ওৎ পেতে থাকবে এবং শৃগালের মত চতুর হবে, সে হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের। সে যদি মুকাবিলায় আসে এবং তুমি বিজয়ী হও, তবে তাকে টুকরো টুকরো করে দিও। তবে যতদূর পার, জনগণকে ব্যাপক রক্তপাত রক্ষা কর।"

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আমীর মুয়াবিয়ার মৃতুর প্রাক্কালে ইয়াযীদ তাঁর কাছে ছিলনা। তিনি এই ওসিয়তগুলো যাহহাক বিন কায়েস ও মুসলিম বিন উকবার মাধ্যমে ইয়াজিদের কাছে পৌছান।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ৬০ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম হুসাইন (রা)

ইমাম হুসাইন (রা) ৪র্থ হিজরীর ৫ই শাবান মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁর নাম রাখেন হুসাইন। রাসূলের (সা) ইন্তিকালের সময় ইমাম হুসাইনের বয়স ছিল সাত বছর সাত মাস সাত দিন। এ জন্য তিনি তাঁর পিতার মত অত দীর্ঘদিন রাসূল (সা) এর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাননি। হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল (সা) তাঁকে ও তাঁর ভাই হাসান (রা) কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদেরকে দেখার জন্য তিনি প্রতিদিন একবার হযরত ফাতেমার (রা) বাড়ীতে যেতেন, তাদেরকে ডেকে আদর সোহাগ করতেন ও সাথে নিয়ে বিভিন্ন খাবার জিনিস খাওয়াতেন। জনৈক সাহাবীর বর্ণনা:
"একবার রাসূল (সা) মাগরিব অথবা এশার নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে এলেন। তখন তাঁর কোলে ইমাম হাসান অথবা হুসাইন ছিল। নামায পড়ানোর সময় হলে তাকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখলেন এবং নামায শুরু করে দিলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। অনেক সময় কেটে গেলে আমি মাথা উঁচু করে দেখি, শিশুটি তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে এবং সে জন্য তিনি দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে আছেন। এটা দেখে আমি পুনরায় সিজদায় চলে গেলাম। নামায শেষে লোকেরা রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, "হে রাসূল, আপনি একটা সিজদা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে করেছেন।

আমরা ভেবেছি, আপনি কোন অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, অথবা এই সময় আপনার কাছে কোন ওহি নাযেল হয়ে থাকবে।"

রাসূল (সা) বললেন: "এ দুটোর কোনটাই ঘটেনি। আমার নাতি আমার পিঠে চড়াও হয়ে বসেছিল। ওকে নামিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি।"

একবার রাসূল (সা) হযরত ফাতেমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে ভেতর থেকে হযরত হুসাইনের কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন এবং মেয়েকে বললেন: "তুমি জাননা, ওদের কান্না শুনলে আমার কষ্ট হয়।"

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসামা ইবনে যায়দ বর্ণনা করেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে রাতের বেলা রাসূল (সা) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি চাদরের ভেতরে কি যেন আবৃত করে বাইরে এলেন। আমি কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল, আপনি চাদরে কী লুকিয়ে রেখেছেন? তিনি চাদর সরালেন। দেখা গেল, ভেতরে শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) রয়েছে। তিনি বললেনঃ "এরা দু'জন আমার মেয়ের ছেলে। হে আল্লাহ, আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। তুমিও এদের উভয়কে এবং এদের উভয়কে যারা ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোবাস।"

হযরত ওমরও (রা) হাসান হুসেন ভ্রাতৃদ্বয়কে খুবই স্নেহ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, হযরত ওমর (রা) ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে এত ভালোবাসতেন যে, নিজের ছেলেদের ওপরও তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। একবার তিনি মদীনার মুসলমানদের মধ্যে কিছু মুদ্রা বন্টন করলেন। তন্মধ্যে এই দুই ভাইকে দশ হাজার দিরহাম করে দিলেন। তা দেখে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন:

"আব্বা, আপনি তো জানেন, আমি অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং হিজরতও করেছি। তবুও আপনি এই দুটো ছেলেকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দেন?"

হযরত ওমর (রা) বলেন: "আব্দুল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। তুমি আমাকে বল তোমার নানা কি হাসান-হুসাইনের নানার মত? তোমার মা কি তাদের মার মত? তোমার নানী কি তাদের নানীর মত? তোমার চাচা কি তাদের চাচার মত? তোমার ফুফু কি তাদের ফুফুর সমান? শোন, তাদের নানা নবীকুল শিরোমনি রাসূলুল্লাহ (সা)। তাদের মা বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী হযরত ফাতেমা (রা)। তাদের নানী হযরত খাদীজা (রা)। তাদের মামা রাসূল (সা) এর ছেলে ইবরাহীম। তাদের খালা রাসূল (সা) এর মেয়ে হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম। তাদের চাচা হযরত জাফর (রা) এবং তাদের ফুফু উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব।"

হযরত আলী (রা) খেলাফত কালে যে সব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়, সেগুলোতে হযরত হুসাইন (রা) তার বাবার সাথে সাথে থাকতেন। উষ্ট্র যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি

সর্বোচ্চ মানের বীরত্ব, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। এক যুদ্ধে তিনি সামনে এগিয়ে "হাল মিন মুবারিয" (আমার সাথে যুদ্ধ করার সাহস কারো আছে নাকি?) বলে হাঁক দিলেন। তখন যাবারকান নামক এক ব্যক্তি মস্ত বড় যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে এগিয়ে এসে বললোঃ "তুমি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আলী (রা) ছেলে হুসাইন।"

যাবারকান এ কথা শুনে বললোঃ "বৎস তুমি বাড়ী চলে যাও। একদিন আমি রাসূল (সা) কে দেখেছি, একটা উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে কাবার দিকে যাচ্ছেন, আর তুমি রাসূল (সা) এর সামনে বসে আছ। তোমার রক্তে হাত রঞ্জিত করে রাসূল (সা) এর সাথে মিলিত হই এটা আমার ইচ্ছা নয়।"

ইবনে মূলজাম নামক ঘাতক যখন হযরত আলীকে (রা) তরবারী দিয়ে আঘাত করলো এবং তাঁকে আহত অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি মৃত্যু আসন্ন বলে উপলব্ধি করলেন। তাই কাল বিলম্ব না করে সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করা শুরু করলেন। হযরত হুসাইনকে ডেকে বললেনঃ

"আমি তোমাদের দু ভাইকে ওসিয়ত করছি যে, আল্লাহকে ভয় করে চলবে, যে জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্য আক্ষেপ করবে না। (সম্ভবত উভয় ছেলের খেলাফত থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই আগে ভাগে তাদেরকে সান্তনা দিলেন) সব সময় মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং হত্যাকারীর মোকাবিলায় মজলুমকে সাহায্য করবে।"

“হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! খবরদার, আমীরুল মুমিনীনকে শহীদ করা হয়েছে-

এই অভিযোগ তুলে মুসলমানদের রক্তপাত করোনা। আমার হত্যাকারীকে ছাড়া আর কাউকে হত্যা করোনা। আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আমার হত্যাকারীকে এক কোপেই হত্যা করে ফেলবে। তার অংগপ্রত্যংগ কেটনা। কেননা আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, তোমরা পাগলা কুকুরকেও কষ্ট দিয়ে বা অংগ প্রত্যংগ টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করোনা, বরং এক কোপে হত্যা কর।" ইমাম হুসাইন (রা) কে এই সব উপদেশ দেয়ার পর তিনি তার তৃতীয় সন্তান মুহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "আমি তোমার ভাইকে যে উপদেশগুলো দিয়েছি, তুমি কি তা শুনেছ? সে বললোঃ "জ্বি হা।"

হযরত আলী (রা) বললেনঃ আমি তোমাকেও এই সব উপদেশ দিচ্ছি। সেই সাথে এ

নসিহতও করছি, তোমার ভাইদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাদের সম্মান কর, তাদের অগ্রগন্যতার দিকে লক্ষ্য রেখ এবং তাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজ করোনা। এরপর তিনি হযরত হুসাইনকে বললেন: "আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, তুমি মুহাম্মাদের সাথে সদাচরণ কর। কেননা সে তোমাদের ভাই। ওকে আমি ভালোবাসি। তাই তোমরাও ওকে ভালোবাস।"

ইবনে মুলজাম হযরত আলীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল ১৯শে রমযান (হিঃ ৪০) রাতে। (মোতাবেক ১৯ আগস্ট, ৬৬১) আর সেই আঘাতের প্রভাবে তিনি ২১শে রমযান ইন্তিকাল করলেন। ফজরের আগেই কাফন দাফন সম্পন্ন হলো।

ইবনে মুলজামকে হযরত আলী (রা) যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই হত্যা করা হলো।

:

হযরত আলীর (রা) তিরোধানে আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে রাশেদা তথা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ধারাবাহিক শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। তারপর হযরত হাসান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নামমাত্র খলিফা নিযুক্ত হন, যার কার্যকরিতা কয়েকটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত আলী (রা) সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই বলেছেন! "তার চরিত্রে যদি হযরত ওমরের কঠোরতা থাকতো, তবে আরবদের মত দুর্দান্ত জাতিকে আরো সাফল্যের সাথে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তার ক্ষমাশীলতা ও উদারতাকে দুর্বলতা গণ্য করা হয়।"

হযরত ইমাম হাসানের (রা) খিলাফত

হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর তাঁর ছেলে ইমাম হাসানকে (রা) কুফাবাসী খলিফা নির্বাচিত করে। পিতার শাসনাধীন অঞ্চলে খলিফা নির্বাচিত হলে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীগণও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অপর দিকে সিরিয়া ও মিশরের একচ্ছত্র শাসক ও রাজা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যে আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলীর (রা) খিলাফত মেনে নিতে পারেননি, তিনি হযরত হাসানের (রা) খিলাফত কিভাবে মেনে নেবেন। তাই যে চক্রান্তের মাধ্যমে তিনি হযরত আলীকে (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন, ঠিক সেই একই উপায় তিনি সরলমতি ও দুর্বলচিত্ত ইমাম হাসানকেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার দুরভিসন্ধী আঁটেন।

তিনি ইমাম হাসানের (রা) বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে রাজধানী কুফায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইমাম হাসান (রা) হযরত আলীর (রা) রেখে যাওয়া ৪০ হাজার সৈন্যের সুশৃংখল বাহিনীর অধিকারী হলেও নিজে যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তিনি সেনাপতি কায়েসের নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনীকে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য পাঠালেন। কায়েস বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেন। মুয়াবিয়া (রা) অবস্থা বেগতিক দেখে আবার চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে গুজব ছড়ালো যে, কায়েস পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। এর ফলে হাসানের (রা) বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এতে ইমাম হাসান (রা) বিচলিত হয়ে কুফা ছেড়ে পারস্যের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, ইমাম হাসান (রা) নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। কুফাবাসীর কাপুরুষতা দেখে তিনি যুদ্ধ জয়ের আশা ত্যাগ করে

মুয়াবিয়ার (রা) কাছে সন্ধির প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি পাঠান। আমীর মুয়াবিয়া (বা) তৎক্ষণাত সন্ধিতে সম্মত হন।

সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ:

১. ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়াকে (রা) খলিফা বলে স্বীকৃতি দেবেন।

২. মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের (রা) দ্বিতীয় ভাই ইমাম হুসাইন (রা) খলিফা হবেন। ততদিন ইমাম হুসাইন বার্ষিক ২০ লাখ দিরহাম ভাতা পাবেন।

৩. ইরাকবাসীকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং কাউকে অতীত ঘটনার জন্য কোন শাস্তি দেয়া হবেনা।

৪. আহওয়াজের রাজস্ব ইমাম হাসানের (রা) নামে লিখে দেয়া হবে।

৫. ইমাম হাসানকে (রা) এককালীন নগদ পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম দেয়া হবে।

৬. বনু হাশেমের সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দান ও উপঢৌকন প্রদান করা হবে।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অম্লান বদনে সবকটা শর্ত মেনে নেন। আর তৎক্ষণাত ইমাম হাসান (রা) সপরিবারে মদীনায় গিয়ে অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করেন। আট বছর পর ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার (রা) ছেলে ইয়াযীদের চক্রান্তে মায়মুনা নাম্মী এক কুটীল রমনীর প্ররোচনায় স্বীয় স্ত্রী যায়েদার হাতে বিষ খেয়ে ইমাম হাসান (রা) শহীদ হন। বনু হাশেম গোত্র ইমাম হাসানের (রা) সন্ধিতে সায় দেয়নি। ইমাম হুসাইনও হাসানকে এই সন্ধি করতে নিষেধ করেন।

ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার রাজনীতি

ইমাম হাসানের (রা) সাথে আমীর মুয়াবীয়া (রা) যে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, তাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের ছোট ভাই ইমাম হুসাইন (রা) খলিফা হবেন। কিন্তু ৬৭৯ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুর এক বছর আগে সন্ধিচুক্তির শর্ত ভংগ করে নিজের ছেলে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। ফলে ৬৮০ খৃস্টাব্দে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হলে ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহন করেন। ইয়াযীদকে এই সিংহাসন লাভ করার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয়নি এবং এর কোন যোগ্যতাই তার ছিলনা। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেল, নিজের বাবার স্থলে সে রাজা হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা তার রাজত্বকে মোটেই পছন্দ করেনি। কারণ ইয়াযীদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলো বিশদভাবে সমাজের সবাই না জানলেও ইমাম হুসাইন (রা) যে তার তুলনায় অনেক বেশী সৎ ও চরিত্রবান, সেটা সবাই জানতো। সবার ধারণা ছিল, হযরত আলীর (রা) সাথে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) যত বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হোক না কেন, রাসূলে করীমের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও ওহী লেখক হয়ে তিনি অন্তত ইয়াযীদকে খলিফা নিয়োগ করবেন না, বরং হয় নিজের বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে থেকে কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে যাবেন, নতুবা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের

কাজ তিনি সাধারণ মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করে যাবেন। কিন্তু তিনি এ দুটোর কোনটিই করেননি।

ইয়াযীদ রাজত্ব লাভের পর তিন বছরের বেশী বেঁচে থাকেনি। এই তিন বছরে সে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অতিষ্ট করে তুলেছিল এবং নিজের শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সে ইসলাম ও মুসলিম জাতির জঘণ্যতম দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। পবিত্র মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ চালিয়ে উভয়ের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা ও ইমাম হুসাইনকে (রা) শহীদ করা এত বড় অপরাধ যে, এর যে কোন একটাই কাউকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম যালেম শাসক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

ইয়াযীদ ক্ষমতায় এসেই এমন সব কাজ শুরু করে দেয়, যা থেকে মনে হয়, তার ভেতরে ইনসাফ, সত্য প্রীতি ও ন্যায় পরায়ণতা তো দূরে থাক, ন্যূনতম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত ছিলনা। বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসক নিয়োগ করার সময় সে যেমন দক্ষতার পরিচয় দেয়নি, তেমনি তাদেরকে জনসাধারণের সাথে সদয় ও ন্যায়সংগত আচরণ করার উপদেশও দেয়নি। সুতরাং তার শাসনামলে যা কিছু ঘটেছে এবং তার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশাসকরা যে সব কাজ করেছে, সে সবের জন্য ইয়াযীদ প্রত্যক্ষভাবেই দায়ী। ইয়াযীদ যদি তার অধীনস্থ প্রশাসকদেরকে সদয় ও নম্র আচরণ করতে বলতো এবং অন্যায় অত্যাচার করলে শাস্তির ব্যবস্থা করতো, বা অন্তত ভয় দেখাতো, তাহলে কেউ তার হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাত না। বিদ্রোহ দমনের নামে মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ ও গণহত্যা, যত্রতত্র কথায় কথায় হত্যা এবং সর্বশেষে ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ড- বলতে গেলে এগুলো নিয়েই ইয়াযীদের তিন বছরব্যাপী শাসনামল কেটে গেছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সদাচরণ করার উপদেশ দেয়ার পরিবর্তে সে তাদেরকে চরম সেচ্ছাচারমূলক আচরণ করার অবাধ অনুমতি দিয়ে রেখেছিল। তার আমলের সার্বিক তৎপরতা পর্যালোচনা করলে মনে হয় কুরআন ও সুন্নাহকে রাজনৈতিক অংগন থেকে অঘোষিতভাবে হলেও পুরোপুরি নির্বাসিত করা হয়েছিল। এমন কি কেউ তাকে কোন ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ, ইসলামী মূল্যবোধ বা মানবতার দাবী সম্পর্কে কোন সদুপদেশ দিতেও সাহস করতোনা। কেননা এ ধরণের সদুপদেশ দানের ধৃষ্টতা কেউ দেখালে কারাদণ্ড নয়, বরং প্রাণদণ্ডই ছিল তার ন্যূনতম শাস্তি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এহেন নিষ্ঠুর নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন, বিশেষত এমন এক সময়ে, যখন রাসূল (সা) এর পবিত্র যুগের গর এক শতাব্দীও পার হয়নি এবং তাঁর ও খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ শত শত জীবিত সাহাবী সমেত বিদ্যমান, এত বড় কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নামান্তর ছিল, যা কোন অবস্থাতেই মার্জনীয় বিবেচিত হতে পারেনা। আর ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই এহেন অন্যায় ও হিংস্র হয়, যা পূরণ করার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকেনি

রাজনীতির প্রচলনে ইসলামী রাষ্ট্রের এত বড় ক্ষতি সাধিত হয়,যা পূরণ করার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকেনি।

ইয়াযীদের জন্ম হয়েছিল হযরত উসমানের শাসনামলে, ২৫ অথবা ২৬ হিজরী সনে, মোতাবেক ৬৪৬ বা ৬৪৭ খৃস্টাব্দে। বাবা হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের পর যখন তাকে রাজকীয় মুকুট পরানো হয়, তখন সর্বপ্রথম তার মাথায় এই চিন্তা প্রবেশ করে যে, যারা তার বাবার আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদেরকে যে কোন প্রকারেই হোক, আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা চাই-ই চাই। তাই সে মদীনার প্রশাসক ওলীদ বিন উকবাকে হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের খবর জানিয়ে চিঠিতে নির্দেশ দিল যে, "হযরত আলীর (রা) ছেলে ইমাম হুসাইন (রা), হযরত ওমরের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত যুবাইরের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহর (রা) (হযরত আবু বকরের দৌহিত্র) কাছ থেকে অবিলম্বে আনুগত্যের শপথ আদায় করে নাও, আনুগত্যের শপথ না করা পর্যন্ত তাদেরকে তোমার কাছ থেকে যেতে দিওনা।"
ইয়াযীদের চিঠি পাওয়া মাত্রই ওলীদ তার পূর্বতন মদীনার শাসক মারওয়ান বিন হাকামকে ইয়াযীদের চিঠি দেখালো ও তার পরামর্শ চাইল। মারওয়ান পরামর্শ দিল যে, এই সাহাবীত্রয়কে এক্ষুনি ডেকে এনে আনুগত্যের শপথ করতে বাধ্য বরা উচিত। সে একথাও বললোঃ
"আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ক্ষমতার দাবীদার নন। উনি যদি আনুগত্যের শপথ নাও করেন, ক্ষতি নেই। ক্ষতির আশংকা আছে ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে। কাজেই ঐ দু'জনকে কাল বিলম্ব না করে এক্ষুনি ডেকে আনাও এবং আনুগত্যের শপথ করতে বাধ্য কর। করলে ভালো। নচেত তাদেরকে জীবিত বাইরে যেতে দিওনা।"
ওলীদ একজন বালককে পাঠালো ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে (রা) ডেকে আনতে। তারা দু'জন তখন মসজিদে নববীতে ছিলেন। এমন অসময়ে ডাক পড়াকে তারা দু'জনেই অশনি সংকেত মনে করে বললেন: “মনে হচ্ছে, মুয়াবিয়া (রা) মারা গেছেন। এ জন্য আমাদেরকে ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ করতে ডাকা হচ্ছে।" গেলেন। লোকগুলোকে বললেন "তোমরা দরজার ওপর বসে থাক। আমি যদি তোমাদেরকে ডাকি অথবা যদি শুনতে পাও, আমি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছি, তাহলে সবাই ঘরের ভেতরে চলে আসবে। তবে এ ধরনের কিছু না ঘটলেও দরজা থেকে সরবেনা যতক্ষণ আমি বাইরে না আসি।"
নিজের অনুগত কয়েক ব্যক্তিকে পাহারারত রেখে হযরত হুসাইন (রা) ভেতরে অবস্থানরত ওলীদ ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। ওলীদ তাঁকে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইন্তিকালের খবর জানালো এবং ইয়াযীদের চিঠি পড়ে শোনালো। ইমাম হুসাইন (রা) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন” পড়লেন এবং বললেন: আল্লাহ হযরত মুয়াবিয়ার ওপর করুনা করুন। তবে আমার মত ব্যক্তি গোপনে আনুগত্যের শপথ করতে পারেনা। আপনি এ উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের সমাবেশ আহ্বান করুন। আমিও তাদের সাথে আসবো। সকলে যা সমীচীন মনে করে, সেটাই করা হবে।"

ইমাম হুসাইনের (রা) এই রাজনীতিক সুলভ কুশলী জবাবে ওলীদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এবং তাকে যাওয়ার অনুমতি দিল। তাঁর চলে যাওয়ার পর মারওয়ান ওলীদকে বললো: 'তুমি হুসাইনকে (রা) চলে যেতে দিয়ে ভুল করলে। এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের সাথে হুসাইনের (রা) রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। বিনা যুদ্ধে হুসাইনকে তুমি আর বাগে আনতে পারবেনা।"

ওলীদ বললো: "তুমি বল কী? তুমি কি সত্যই চাও আমি হুসাইনকে হত্যা করি? আল্লাহর কসম, কেয়ামতের দিন যাকে হুসাইনের খুনী হিসাবে আসামী করা হবে, তার আর নিস্তার থাকবেনা।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ওলীদের কাছ থেকে একদিনের সময় চাইলেন এবং রাতের ভেতরেই মদীনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। সকাল বেলা যখন ওলিদ জানলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর মদীনা থেকে পালিয়েছেন। তখন সে তাঁর পেছনে কয়েকজন ঘোড় সওয়ার জওয়ানকে পাঠালো। কিন্তু তিনি মক্কার দিকে এমন এক অজানা পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন, ওলীদের লোকেরা যার হদিস পেলনা এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে রজব, ৬০ হিঃ (৩রা মে, ৬৮০ খৃ.) গভীর রাতে ইমাম হুসাইনও (রা) পরিবার পরিজনসহ মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। একমাত্র তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া মদীনায় থেকে গেলেন। এরপর ওলীদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে ডেকে আনালেন। উভয়ে বিনা বাক্য হয়ে ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ করলেন।

ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায় পৌঁছলেন ৩রা শাবান তারিখে। তিনি শিয়াবে আলীতে অবস্থান করতে লাগলেন। মক্কাবাসী দলে দলে তার কাছে আসতে লাগলো। আর হযরত ইবনে যুবাইর কা'বা শরীফে অবস্থান করতে লাগলেন এবং দিনরাত এবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে এসে আলাপ আলোচনাও করতেন।

ইরাক থেকে গণ আমন্ত্রণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ইরাকে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন। ইরাক থেকে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকে যে, আপনি এখানে চলে আসুন। আমরা আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবো এবং আমীর মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবো। চিঠি ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে এই গণ আমন্ত্রণের ধারা হযরত হাসানের (রা) আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা) সব সময় একই জবাব দিতেন: অপেক্ষা কর ও ধৈর্য ধারণ কর। আমীর মুয়াবিয়া অংগীকার করেছিলেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন, ইমাম হুসাইনকে (রা) তিনি বিব্রত করবেননা এবং নিয়মিত ভাতা দিতে থাকবেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি যথারীতি

পালনও করে যাচ্ছিলেন। তাই ইমাম হুসাইন (রা) আমীর মুয়ারিয়া (রা) কে উত্যক্ত করার কোন প্রয়োজনবোধ করেননি।

ইরাকের জনগণের সাথে, বিশেষত কুফাবাসীর সাথে হযরত হুসাইনের (রা) যে চিঠির আদান প্রদান চলতো, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) আঞ্চলিক প্রশাসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গোয়েন্দারা তার খবরাদি সব সময় আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) পৌঁছাতো। এই সূত্র ধরে তারা আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) এরূপ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতো যে, ইমাম হুসাইন (রা) বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাইতুল মাল থেকে তার ভাতা বন্ধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া (রা) প্রতিবার তাদেরকে বলতেন, তোমরা হুসাইনকে (রা) কোনভাবে বিব্রত করোনা, তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করোনা। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ভাতা তাঁর কাছে পৌছিয়ে দিতে কোনই ত্রুটি করতেন না।

আমীর মুয়াবিয়ার আমলে ওলীদ বিন উতবা নামক তার জনৈক প্রশাসক ইমাম হুসাইন (রা) ও তার সমর্থকদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে এই চেষ্টা তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নির্দেশে করেছিলেন, না নিজের বিবেচনা অনুসারে করেছিলেন, তা জানা যায়নি। ওলীদ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সদাশয় প্রশাসক ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন: ওলীদ যখন মদীনার গভর্ণর হয়ে এলেন, তখন জেলখানায় যত কয়েদী ছিল, সবাইকে মুক্ত করে দিলেন এবং শহরে যত ঋণগ্রস্ত লোক ছিল, সবার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। ইমাম হুসাইনকে তিনি খুবই সম্মান ও ভক্তি করতেন। তাই তার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, এভাবে তিনি ইমাম হুসাইনকে (রা) আমীর মুয়াবিয়ার আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

কেননা হযরত হুসাইন (রা) ও তার সমর্থকদের মাঝে যখন যোগাযোগ থাকবেনা তখন আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইমাম হুসাইন (রা) এর দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন এবং তার ওপর কোন রকম নির্যাতন চালাবেন না।

ইরাকের অন্য সব শহরের তুলনায় কুফাবাসী ইমাম হুসাইনের (রা) সবচেয়ে বেশী ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল এবং তার নেতৃত্বে মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব ছিল। তারা যখন শুনলো, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হয়েছে এবং ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ (বায়য়াত) করেননি, তখন তারা সুলায়মান বিন সারদ খাযায়ীর বাড়ীতে একটা গোপন সমাবেশে মিলিত হলো। এই সমাবেশে সুলায়মান ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন: 'হুসাইন (রা) মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা চলে গেছেন। তোমরা তাঁর ও তাঁর বাবার সমর্থক ও অনুসারী। এই সময়ে তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য করতে ও তার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও, তবে তাকে চিঠি লিখে দাও, যেন উনি এখানে চলে আসেন। কিন্তু তোমরা যদি নিজেদেরকে দুর্বল ভেবে ভয় পাও, তাহলে অনর্থক তাকে বিপদে ফেলনা।"

স্মরণ করা যেতে পারে, ঠিক এ ধরনেরই একটা ভাষণ ও সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছিল রাসূল (সা) এর মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে আকাবার বায়য়াতের সময় মদীনার আনসারদের

এক নেতার মুখ থেকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মদীনার আনসাররা রাসূলে করীমের (সা) ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত যেরূপ দৃঢ়তা ও নির্ভিকতা দেখিয়েছিলেন, হযরত আলী (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) এর সমর্থকবৃন্দ যে তার ভগ্নাংশও দেখাতে পারেনি, কারবালার মর্মন্তদ ঘটনাই তার সাক্ষী।

সুলায়মানের ভাষণ শুনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলো: "আমরা অবশ্যই
হুসাইনের (রা) শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বো। প্রয়োজনে জীবন বাজী রেখে তাকে
বিজয়ী করবো।" এরপর সর্বসম্মতভাবে ইমাম হুসাইনকে একটা চিঠি লেখা হলো, যার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুলাইমান বিন সারদ খাযায়ী, মুসাইয়াব বিন বাখবা, রিফাহ বিন শাদ্দাদ, হাবীব বিন মুযাহির, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল ও অন্যান্য ঈমানদার ভক্তবৃন্দ ও সমর্থকবৃন্দের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন হুসাইন বিন আলীর নিকট বিনীত নিবেদন। আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন। আল্লাহর শোকর, তিনি আপনার সেই দুশমনকে চিরনিদ্রায় শায়িত করেছেন যে চরম দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিল, (অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়া (রা)) যে মুসলিম উম্মাহর গোটা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবকাঠামোকে লণ্ডভণ্ড ও তার শান্তি শৃংখলাকে বিনষ্ট করেছে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর শাসন চালিয়েছে, উম্মাতের পুণ্যবান লোকদেরকে শহীদ করেছে, অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সাথী বানিয়েছে এবং আল্লাহর সম্পদকে সাথীদের ও আত্মীয়দের মধ্যে নির্বিচারে বিতরণ করেছে। আমাদের এখন কোন নেতা নেই। আপনি চলে আসুন, যেন আপনার সাহায্যে ও নেতৃত্বে আমরা সত্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। কুফার শাসক নুমান ইবনে বশীর সরকারী ভবনে আছে। তার পেছনে আমরা জুময়ার নামাযও পড়িনা, ঈদের নামাযও পড়িনা। আপনি আসছেন জানতে পারলে ওকে আমরা সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেব। হে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র, আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শক্তি ও সামর্থের যোগান দিতে সক্ষম নয়।”

কুফাবাসীর এই চিঠি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসমা হামযানী ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালের হাতে সোপর্দ করা হলো। তারা দু'জনে অতি দ্রুত গতিতে দশই রমযান তারিখে মক্কায় পৌঁছলেন এবং ইমাম হুসাইনের (রা) নিকট চিঠিটা হস্তান্তর করলেন।

কুফাবাসী ক্রমেই অধীর হয়ে উঠলো। উক্ত চিঠি পাঠানোর দু'দিন যেতে না যেতেই তারা কায়েস বিন মাশহাদসহ ৪/৫ জনকে শহরের আরো দেড়শো গণ্যমান্য ব্যক্তির চিঠি দিয়ে ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে পাঠালো। এ সব চিঠিতেও তাকে তাড়াতাড়ি কুফা আসতে বলা হয়েছিল। এর পরও তারা দেরী সইতে পারলোনা। তারা এই দেড়শো চিঠি পাঠিয়েও ক্ষান্ত হলোনা এবং নিশ্চিন্ত হতে পারলোনা। দু'দিন অপেক্ষা করে পুনরায় হানী বিন সাবীয়ী ও সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হানাফী নামক দু'ব্যক্তিকে এই মর্মে এক চিঠি দিয়ে পাঠালো:

"ঈমানদার ভক্ত ও একনিষ্ঠ সমর্থকদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন বিন আলীর কাছে প্রেরিত সাদর আমন্ত্রণ।
জনগণ অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষমান। তারা আপনার ছাড়া আর কারো শাসন মেনে নেবেনা। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব এখানে চলে আসুন। ওয়াস্ সালাম।" এই চিঠির পর আরো একটা চিঠি লেখা হয়। তাতে লেখা হয়েছিল:
"সমগ্র ইরাকে সবুজের সমারোহ ঘটেছে। সমস্ত ফলমূল পেকে গেছে। আপনার সাহায্যের জন্য বাহিনী প্রস্তুত। আপনি চলে আসুন।"
অথচ পরম পরিতাপের বিষয়, এমন উপচে পড়া আবেগে পরিপূর্ণ চিঠির পর চিঠি পাঠিয়েও কুফাবাসী ইমাম হুসাইনকে (রা) দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেনি।
যখন ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে ক্রমাগত কুফাবাসীর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণপত্র আসতে লাগলো, তখন তিনি তার অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার পর হানী ও সাঈদ নামক দূত দ্বয়ের কাছে কুফাবাসীকে সম্বোধন করে নিম্নরূপ চিঠি লিখে পাঠালোন:
"আপনাদের ইচ্ছা আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি। আমি আমার চাচাতো ভাই ও বিশ্বস্ত মুসলিম বিন আকীলকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। আমি তাকে বলে দিয়েছি, সাঠিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিয়ে সে যেন আমাকে জানায়। আমি যদি বুঝতে পারি, কুফার জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চিঠিতে যেমন ব্যক্ত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবেই আমার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী, তাহলে আমি ইনশায়াল্লাহ শীগগীরই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবো। আসল কথা হলো, মুসলমানদের নেতা এমন ব্যক্তিরই হওয়া উচিত যিনি আল্লাহর কিতাব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন, ন্যায় বিচার করেন এবং সত্যদ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেন।".
মুসলিম বিন আকীলকে কুফা পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি কুফাবাসীর সত্যিকার অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চান, তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা জেনে নিতে চান এবং কুফাবাসী তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত কিনা, সে সম্পর্কে আগেভাগেই গ্যারান্টি চান। এ পদক্ষেপ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষ থেকে কুফা রওনা হবার আগে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব ও প্রয়োজন ছিল, তা অবলম্বন করতে তিনি সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কোন ত্রুটি করেননি।
কিন্তু ইমাম হুসাইনের (রা) ঘনিষ্ঠ সাথীরা কুফাবাসীকে মোটেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলনা। যখন ক্রমাগত চিঠি আসতে লাগলো, তখন তারা হযরত হুসাইনকে (রা) অনেক বুঝালেন যে, এই লোকেরা আপনার বাবাকেও প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য না করে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর তারা আপনার বড় ভাই হাসানের (রা) সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আনুগত্যের শপথ ভংগ করেছে। তারা আপনার সাথেও একই আচরণ করে বসলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা। তাই আপনি নিজে যাওয়ার আগে মুসলিমকে সেখানে পাঠান, যাতে

তিনি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতির যথাযথ অনুসন্ধান চালাতে পারেন এবং আপনাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করেন।

মুসলিম বিন আকীল কুফা চলে গেলেন। তিনি মুখতার বিন আবি উবাইদের বাড়ীতে উঠলেন। হযরত আলীর (রা) পুরানো ভক্তরা মুসলিমের কাছে দলে দলে আসতে লাগলো। তিনি তাদেরকে হযরত হুসাইনের (রা) চিঠি পড়ে শুনাতে লাগলেন। তারা কেঁদে কেঁদে নিজেদের অনুরাগ ও আবেগ উজাড় করে দিয়ে অংগীকার করতে লাগলো যে, হযরত হুসাইনের (রা) নিরাপত্তা ও জয়ের জন্য প্রয়োজনে তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবেনা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আঠারো হাজার, মতান্তরে ত্রিশ হাজার কুফাবাসী মুসলিম বিন আকীলের হাতে হাত দিয়ে ইমাম হুসাইনের আনুগত্যের বায়য়াত করলো। মুসলিম ইমাম হুসাইনের (রা) নির্দেশ অনুসারে আবেস বিন আবি শুবাইব নামক দূতের মাধ্যমে তার কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। এই চিঠিতে লেখা ছিল! আঠারো হাজার ব্যক্তি বায়য়াত করেছে। আপনি নির্দ্বিধায় চলে আসুন। ইরাকবাসী আপনার সমর্থক এবং মুয়াবিয়ার (রা) বংশধরকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতায় দেখতে চায়না। 44

এ সময়ে কুফার প্রশাসক ছিলেন রাসূল (সা) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নুমান বিন বশীর (রা)। তিনি এ সব ঘটনা জানতে পেরে জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহন করে আল্লাহর প্রশংসা করার পর নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেন: "হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলিম জাতির ভেতরে বিভেদ, বিশৃংখলা, অরাজকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করোনা। ভালোভাবে স্মরণ রাখ বিভেদ, বিশৃংখলা ও অরাজকতা হত্যা, রক্তপাত ও লুণ্ঠনের পথ সুগম করে। আমি নিছক ধারণা ও অনুমাণের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইনা। যে ব্যক্তি আমার সাথে যুদ্ধ করতে চায় না, আমিও তার সাথে যুদ্ধ করবোনা। যে ব্যক্তি আমার ওপর আক্রমণ চালাবেনা, আমিও তার ওপর আক্রমণ চালাবোনা। তবে তোমরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও ইয়াযীদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভংগ করলে আমি যতক্ষণ ক্ষমতায় আছি, তরবারী হাতে নিয়ে তোমাদের মস্তক ছেদন করতে থাকবো।"

নুমান বিন বশীর অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও উদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তার এ ভাষণের পর জনৈক উগ্রপন্থী উমাইয়া বংশীয় উঠে দাড়িয়ে বললো: আমীর সাহেব, আপনি তো দুর্বলতা প্রকাশ করলেন। এতে কাজ হবেনা। সরকারের অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

নুমান জবাব দিলেন: "আমি আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী অব্যাহত রাখলে আমাকে যদি কেউ দুর্বল ভাবে, তবে তাতে আমার কিছুই আসে যায়না। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে প্রতাপশালী আখ্যায়িত হতে চাইনা।"

এই লোকটা ইয়াযীদকে সব খবরাখবর জানিয়ে দিল। সে লিখলো মুসলিম বিন আকীল কুফায় এসেছে এবং জনগণ দলে দলে তার হাতে বায়য়াত হচ্ছে। কিন্তু নুমান বিন বশীর (রা) তা ঠেকাতে পারছেন না। আপনি যদি কুফার ওপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন,

তাহলে এখানে কোন কঠোর ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠান, যিনি আপনার প্রতিটা আদেশকে কার্যকরী করবেন এবং আপনার শত্রুদেরকে কঠোর হাতে দমন করবেন। ইয়াযীদের কাছে এ ধরণের চিঠি আরো কয়েক ব্যক্তিও পাঠালো। ইয়যীদ যখন একের পর এক এ ধরনের চিঠি পেতে লাগলো, তখন সে নিজের বিশ্বস্ত খৃষ্টান সহযোগী ইবনে সারজোনের মতামত চাইল। সে বললো, বসরার শাসক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কুফার শাসক নিয়োগ করুন। উনি এ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবেন। ইয়াযীদ তার এ পরামর্শ গ্রহণ করে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে সাথে কুফারও শাসক নিযুক্ত করলো। ওবায়দুল্লাহকে সে লিখলো, কুফায় গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে সেখান থেকে বহিষ্কার কর অথবা হত্যা করে ফেল। ইয়াযীদের এ চিঠি পেয়ে সে কুফা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে হযরত হুসাইনের (রা) একটা চিঠি তাঁর ভৃত্য সুলায়মানের মাধ্যমে বসরার ইয়াযীদ বিন মাসউদ নাহশালী ও মুনযির বিন জারুদ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌছলো। ঐ চিঠিতে তিনি বসরাবাসীর সাহায্য, সমর্থন ও আনুগত্যের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ চিঠি পেয়ে ইয়াযীদ বিন মাসউদ বনুতামীম, বনু হানযালা ও বনুসা'দ এ তিন গোত্রের লোকজনকে সমবেত করলো এবং জিজ্ঞেস করলো:

"হে বনুতামীম, বলতো আমার বংশ মর্যাদা ও সম্মান প্রতিপত্তি তোমাদের দৃষ্টিতে কেমন?"

তারা বললোঃ হে সরদার, এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কী আছে? সবাই জানে, আভিজাত্যে, সম্মানে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই।"

ইয়াযীদ বিন মাসউদ বললোঃ "তোমাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য চাওয়ার জন্য আমি আজ তোমাদেরকে এখানে ডেকেছি।"

জনতা বললো: 'আপনি বলুন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবো। আমরা আপনার প্রতিটি উপদেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।'' এরপর ইয়াযীদ বিন মাসউদ নিম্নরূপ ভাষণ দিলঃ

"মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে অত্যাচার ও অনাচারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যুলুমের প্রাসাদ ভূমিস্যাত হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার সাম্রাজ্যকে "মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে অত্যাচার ও অনাচারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যুলুমের প্রাসাদ ভূমিস্যাত হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার সাম্রাজ্যকে তিনি মজবুত করে গড়ে তুলছেন। কিন্তু এটা তার আকাশকুসুম কল্পনা প্রমাণিত হয়েছে। মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যুর পর একজন মদখোর পাপাচারী খলিফা হবার দাবী করছে এবং মুসলমানদের ওপর জোরপূর্বক ও তাদের অসম্মতি সত্ত্বেও তার শাসন চাপিয়ে দিতে চাইছে। তার না আছে ইসলামের জ্ঞান, না আছে সহনশীলতা ও উদারতা। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এই জঘণ্য ব্যক্তির (ইয়াযীদ) সাথে জেহাদ করা মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার চেয়েও উত্তম। এই দেখ, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) নাতি ও হযরত আলীর ছেলে হুসাইনের চিঠি এসেছে। তাঁর চেয়ে সৎ ও সম্মানিত ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাঁর জ্ঞান ও মহত্বের পরিচয় দেয়া সূর্যকে প্রদ্বীপ দেখানোর মত নির্বুদ্ধিতার কাজ। মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বয়স, ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং

রাসূল (সা) এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র হুসাইন (রা), যিনি ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করেন। এখন তোমরা আল্লাহর জ্যোতি অর্জনে বেশী করে অংশগ্রহণ কর এবং বাতিলের পথে গিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করোনা। উষ্ট্রযুদ্ধের সময় সুখর বিন কায়েসের নেতৃত্বে যুদ্ধ থেকে তোমরা পিছু হটে এসেছিলে। এখন আল্লাহ তোমাদেরকে আরো একটা সুযোগ দিয়েছেন। তোরা জীবন বাজি রেখে রাসূল (সা) এর দৌহিত্রের সাহায্যের জন্য ঝাপিয়ে পড় এবং অতীতের কলংক মুছে ফেল। আল্লাহর কসম, এখন যে ব্যক্তি হুসাইনের (রা) সাহায্য করা থেকে পিছু হটবে, আল্লাহ তার বংশধরকে অপমান ও লাঞ্ছনার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবেন এবং তার বংশের ওপর ধ্বংস নাযিল করবেন। দেখ, আমি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখনও যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ করবেনা, সে যেন মনে রাখে, সে অপমানজনকভাবে নিহত হওয়া থেকে নিস্তার পাবেনা।"

ইয়াযীদ বিন মাসউদের ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বনু হানযালার লোকেরা উঠে দাঁড়ালো এবং বললোঃ

"হে সম্মানিত সরদার, আমাদেরকে আপনি আপনার ধনুকের তীর ও আপনার গোত্রের ঘোড়া মনে করতে পারেন। আপনি যদি আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, তবে তা হবে অব্যর্থ। আমাদেরকে সাথে নিয়ে জেহাদ করলে আপনি ইনশাআল্লাহ জয়ী হবেন। আপনি যেখানে যাবেন, আমরা আপনার সাথে যাবো। আপনি যে যুদ্ধে অংশ নেবেন, আমরা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাতে অংশ নেব। আমরা তরবারী দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো এবং জীবনের বিনিময়ে আপনাকে রক্ষা করবো। আমরা প্রস্তুত। আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদেরকে নিয়ে চলুন।"

বনু হানযালার পর বনু সা'দ দাঁড়িয়ে বললোঃ "হে ইয়াযীদ বিন মাসউদ, আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন মত দেয়া এবং আপনার বিরোধিতা করার মত ঘৃণ্য কাজ আমাদের কাছে আর কিছু নেই। তথাপি আমাদেরকে সামান্য একটু সময় দিন, আমরা একটু পরামর্শ করে নেই।"

বনু আমের তামীমী বললোঃ

“হে প্রিয় সরদার, আমরা আপনার সাহায্যকারী ও সমর্থক। আমরা আপনার ক্রোধ ও অসন্তোষ সহ্য করতে পারিনা। আপনি আমাদেরকে হুকুম দিয়ে দেখুন, কিভাবে আপনার কাছে ছুটে আসি। আপনি আদেশ দিন, আমরা জীবন দিয়ে আপনার আনুগত্য করবো।" এ সব উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে ইয়াযীদ বিন মাসউদ অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হলেন। • তিনি ইমাম হুসাইনকে (রা) চিঠি লিখলেন:

"আপনার চিঠি আমি পেয়েছি, যে কাজের প্রতি আপনি আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেটা আমি ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছি। আপনার আনুগত্য ও সাহায্য করা আমার জন্য দুর্লভ সৌভাগ্য। এতে আমি গর্ব বোধ করি। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে কখনো সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক থেকে বঞ্চিত করেননি। এ যুগে আপনি আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহর অকাট্য প্রমাণ

এবং পৃথিবীতে তাঁর আমানত স্বরূপ। আপনি যেন একটা মনোরম যয়তুন গাছের ডাল এবং রাসূল (সা) তার মূল। আপনি নির্দ্বিধায় এখানে চলে আসুন। বনু তামীমের মাথাগুলো আপনার সামনে আনত থাকবে। যে উট পাঁচ দিন সফরের পর পানির কাছে উপস্থিত হয়, সেই উটের চেয়েও আপনি অধিক অনুগত দেখতে পাবেন বনু তামীমকে। শুধু বনু তামীম নয়, বনু সা'দও আপনাকে প্রাণপন সাহায্য করবে।

বসরার এক ব্যক্তি মুনযির বিন জারুদ ছিল ইবনে যিয়াদের শ্বশুর। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এই চিঠির তথ্য জেনে ফেললো। সে পত্রবাহক দূতকে পথিমধ্য থেকে ধরে এনে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পৌঁছে দিল। ইবনে যিয়াদ দূতকে তো তৎক্ষনাত হত্যা করলোই। উপরন্তু নিজে জামে মসজিদের মিম্বরে উঠে নিম্নরূপ ভাষণ দিল:

"হে বসরাবাসী, আমীরুল মুমিনীন (ইয়াযীদ) আমাকে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। আমি অনতিবিলম্বে কৃঞ্চায় যাচ্ছি। আমার অবর্তমানে আমার সহোদর উসমান বিন যিয়াদকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করে যাচ্ছি। খবরদার। তোমরা তার হুকুম অমান্য করবেনা। কেউ করলে তাকে, তার বন্ধুবান্ধবকে এবং তার মহল্লার সরদারকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলবো।"

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল বসরাবাসীকে আতংকিত করে দেয়া, যাতে তার অনুপস্থিতিতে কোন বিশৃংখলা না হয়। তার এ উদ্দেশ্য সফল হলো। ফলে তার কৃঞ্চা চলে যাওয়ার পর কারো মনে তার ভাই এর বিরোধিতা করা বা ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষ সমর্থনের কোন আকাংখাই জাগতে দেখা গেলনা। ক্ষমতা ও অস্ত্রের দাপটের সামনে নিরীহ ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত সৎ লোকদের উত্তাল ও বিস্ফোরনোন্মুখ আবেগ উচ্ছাস অল্প সময়ে বুদবুদের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ:

প্রথমে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন এবং তাঁর কাছে একখানা পত্র লিখে দেন। পত্র খানা ছিল নিম্নরূপ:

"সালামে মাসনুন বাদ, আপনাদের পত্র আমার কাছে যথা সময়ে পৌঁছেছে। আপনাদের বর্তমান অবস্থা আমি অনুধাবন করতে পেরেছি। আমার বিশ্বস্ত চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে আপনাদের কাছে প্রেরণ করলাম। তিনি ওখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে পত্র লিখবেন। তিনি সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর যদি আমাকে আসার জন্য পত্র লিখেন, তবে আমি সাথে সাথেই চলে আসব।"

মুসলিম বিন আকীল কুফা গমনের পূর্বে মদীনা শরীফে পৌঁছেন এবং
মসজিদে নববীতে নামায আদায় করেন। অতঃপর পরিবার-পরিজন থেকে বিদায়
নিয়ে কুফা রওয়ানা হন। কুফায় পৌঁছে প্রথমে তিনি মুখতারের গৃহে অবস্থান

করেন। সেই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সেখানে আসতে লাগলেন। যখনই কোন নতুন লোক আসতেন, তখনই মুসলিম বিন আকীল তাকে হযরত হোসাইনের (রা) পত্রখানা পাঠ করে শুনাতেন। যা শুনে, সবার চোখে পানি এসে যেত। মুসলিম বিন আকীল কিছু দিন কুফায় অবস্থান করে বুঝতে পারলেন যে, এখানের সাধারণ মুসলমানগণ ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত হতে মোটেই আগ্রহী নন। বরং তারা হযরত হোসাইনের (রা) হাতে বাইয়াত হতে অত্যন্ত আগ্রহী। মুসলিম ইবনে আকীল এ অবস্থা অবলোকন করে, হযরত হোসাইনের (রা) খেলাফতের ওপর বাইয়াত নেয়া শুরু করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শুধু কুফা থেকে আঠার হাজার মুসলমান হযরত হোসাইনের (রা) খেলাফতের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

কারবালার প্রান্তরে হুসাইন-এর শাহাদাত বরণ করার প্রকৃত ঘটনা

প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হুসাইন তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে পাঠালেন। মুসলিম কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই লোকেরা হুসাইনকে চাচ্ছে। লোকেরা মুসলিমের হাতেই হুসাইনের পক্ষে বয়াত নেওয়া শুরু করল। হানী বিন উরওয়ার ঘরে বায়আত সম্পন্ন হল।

সিরিয়াতে ইয়াজিদের নিকট এই খবর পৌঁছা মাত্র বসরার গভর্ণর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঠালেন। ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফা বাসীকে তার বিরুদ্ধে হুসাইনের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। সে হুসাইনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হানী বিন উরওয়ার ঘরে হুসাইনের পক্ষে বায়আত নেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মুসলিম বিন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিপ্রহরের সময় উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ইয়াজিদের সেনা বাহিনীর ভয় দেখালেন। তিনি এমন ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, লোকেরা ইয়াজিদের ধরপাকড় এবং শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে পলায়ন করতে শুরু করল। কুফা বাসীদের চার হাজার লোক পালাতে পালাতে এক পর্যায়ে মুসলিম বিন আকীলের সাথে মাত্র তিন জন লোক অবশিষ্ট রইল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুসলিম বিন আকীল দেখলেন, হুসাইন প্রেমিক আল্লাহর একজন বান্দাও তার সাথে অবশিষ্ট নেই। এবার

তাকে গ্রেপ্তার করা হল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মুসলিম বিন আকীল উবাইদুল্লাহএর নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন হুসাইনের নিকট একটি চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়। এতে উবাইদুল্লাহ রাজী হলেন। চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল এ রকম:

"হুসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফা বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি। আমার দেয়া এই তথ্য মিথ্যা নয়।" অতঃপর যুল হজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফা দিবসে উবাইদুল্লাহ মুসলিমকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম ইতিপূর্বে কুফা বাসীদের ওয়াদার উপর ভিত্তি করে হুসাইনকে আগমনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির উপর ভিত্তি করে যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে হুসাইন মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে উমার হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন: হুসাইন! আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাবো। জিবরীল আগমন করে নবীজিকে দুনিয়া এবং আখিরাত- এ দুটি থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়া বাদ দিয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁর অংশ। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ কখনই দুনিয়ার সম্পদ লাভে সক্ষম হবেন না। তোমাদের ভালর জন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। হুসাইন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যাত্রা বিরতি করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ইবনে উমর হুসাইনের সাথে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন এবং ক্রন্দন করলেন।

সুফীয়ান ছাওরী ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস হুসাইনকে বলেছেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।

বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুসাইনকে বলেছেন: হোসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেছেন: হুসাইন তাঁর জন্য

নির্ধারিত ফয়সালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর বের হওয়ার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। তবে বল প্রয়োগ করে আমাকে পরাজিত করলে সে কথা ভিন্ন। (ইয়াহ-ইয়া ইবনে মাঈন সহীস সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

যাত্রা পথে হুসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির বিষয় অবগত হয়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা আমর বিন সাদ, সীমার বিন যুল জাওশান এবং হুসাইন বিন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের গতিরোধ করল। হুসাইন সেখানে অবতরণ

করে আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন।

হুসাইন বিন আলী এবং রাসূলের দৌহিত্রকে ইয়াজিদের দরবারে যেতে দেয়া হোক। তিনি সেখানে গিয়ে ইয়াজিদের হাতে বয়াত গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি জানতেন যে, ইয়াজিদ তাঁকে হত্যা করতে চান না।

অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেয়া হোক।

অথবা তাঁকে কোন ইসলামী অঞ্চলের সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেয়া হোক। সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করবেন এবং রাজ্যের সীমানা পাহারা দেয়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করবেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ইয়াজিদের সৈন্যরা কোন প্রস্তাবই মানতে রাজী হল না। তারা বলল: উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ যেই ফয়সালা দিবেন আমরা তা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব মানতে রাজী নই। এই কথা শুনে উবাইদুল্লাহএর এক সেনাপতি (হুর বিন ইয়াজিদ) বললেন: এরা তোমাদের কাছে যেই প্রস্তাব পেশ করছে তা কি তোমরা মানবে না? আল্লাহর কসম! তুর্কী এবং দায়লামের লোকেরাও যদি তোমাদের কাছে এই প্রার্থনাটি করত, তাহলে তা ফেরত দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হত না। এরপরও তারা উবাইদুল্লাহএর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করল। সেই সেনাপতি ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন এবং হুসাইন ও তাঁর সাথীদের দিকে গমন করলেন। হুসাইনের সাথীগণ ভাবলেন: তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহএর সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের দুইজনকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনিও নিহত হলেন।

(ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হুসাইনের সাথী ও ইয়াজিদের সৈনিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। হুসাইনের সামনেই তাঁর সকল সাথী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। অবশেষে তিনি ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলেন না। তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী বীর। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় তাঁর পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। কুফা বাসী প্রতিটি সৈনিকের কামনা ছিল সে ছাড়া অন্য কেউ হুসাইনকে হত্যা করে ফেলুক। যাতে তার হাত রাসূলের দৌহিত্রের রক্তে রঙ্গিন না হয়। পরিশেষে নিকৃষ্ট এক ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। তার নাম ছিল সীমার বিন যুল জাওশান। সে বর্শা দিয়ে হুসাইনের শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে আশুরার পবিত্র দিনে ৫৭ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। বলা হয় এই সীমারই হুসাইনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ কেই বলেন: সিনান বিন আনাস আন্ নাখঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে। আল্লাহই ভাল জানেন। শাহাদত বরণ করার পরে হযরত হোসাইনের (রা) শরীরে তেত্রিশটি তীরের আঘাত এবং চৌত্রিশটি তলোয়ারের আঘাত দেখা গিয়েছিল। এই জালিমরা হযরত হোসাইন (রা) এবং

তাঁর পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করার পরে আলী আসগরের দিকে মনোনিবেশ হলো। শমর তাঁকেও হত্যা করতে চাইলো। হুমায়দ বিন মুসলিম বললো, সুবহান আল্লাহ! তুমি অসুস্থ শিশুকেও হত্যা করতে চাও? শমর তাঁকে ছেড়ে দিলে। ওমর বিন সাদ সামনে অগ্রসর হয়ে বললো, এই মহিলাদের শিবিরের কাছে যেন কেউ প্রবেশ না করে। এই অসুস্থ শিশুর ব্যাপারে কেউ যেন এগিয়ে না আসে।

মৃতদেহ পিষ্ট করা

পাপিষ্ঠ ইবনে যিয়াদের নির্দেশ ছিল যে, হযরত হোসাইনকে (রা) হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ যেন ঘোড়ার খুর দ্বারা পিষ্ট করা হয়। ওমর বিন সাদ কতিপয় সাওয়ারীকে এই কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলো। তারা এ জঘন্য ও অমানবিক কাজটিও করে ফেললো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

নিহতদের এবং শহীদগণের সংখ্যা:

যুদ্ধের শেষে নিহতদের সংখ্যা গণনা করা হলো। এই যুদ্ধে হযরত হোসাইনের (রা) ৭২ জন সাথী শাহাদত বরণ করেন। আর ওমর বিন সাদের ২৮ জন সৈন্য নিহত হয়। হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর শহীদ সাথীগণকে এক দিন পর দাফন করা হলো।

হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের কর্তিত শির ইবনে যিয়াদের দরবারে

খাওলী বিন ইয়াযীদ ও হুমায়দ বিন মুসলিম শহীদগণের এই কর্তিত শির নিয়ে কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছে পেশ করলো। ইবনে যিয়াদ লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে এই শির উপস্থিত করলো। অতঃপর ইবনে যিয়াদ একটি ছুরি হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র চেহারার ওপর রাখলে, যায়িদ বিন আরকাস (রা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠেন, হে ইবনে যিয়াদ। এই পবিত্র চেহারার ওপর থেকে ছুরি সরিয়ে ফেলুন। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই পবিত্র চেহরার ওপর চুমু খেতে দেখেছি। এই কথা বলে, তিনি কেঁদে দিলেন। ইবনে যিয়াদ বললো, হে যায়িদ! তুমি যদি বৃদ্ধ না হতে, তবে এই মুহূর্তে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। যায়িদ বিন আরকাস (রা) এই কথা বলে বাইরে চলে আসলেন যে, হে আরবের লোকেরা! তোমরা হযরত ফাতিমার (রা) পুত্রকে হত্যা করেছ এবং মারজানার পুত্রকে তোমাদের আমীর মনোনীত করেছ।

মনে রেখো! সে তোমাদের ভাল লোকদেরকে হত্যা করবে এবং অন্যায়কারী ও দুষ্টদেরকে গোলাম বানিয়ে নিবে। তোমাদের কি হলো যে, এই অপমান ও লাঞ্ছনাকে তোমরা মেনে নিলে?

বাকী আহলে বাইতগণের কুফায় আগমন ও ইবনে যিয়াদের সাথে কথোপকথন

দু'দিন পরে, ওমর বিন সাদ বাকী আহলে বাইত, হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা, বোন ও পুত্রদেরকে নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইলো। আহলে বাইতগণ এই করুণ দৃশ্য দেখে, কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের ক্রন্দন দেখে মনে হচ্ছে যেন, আকাশ ও পৃথিবীও ক্রন্দন করছে। ওমর বিন সাদ, আহলে বাইতগণকে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করলেন। হযরত হোসাইনের (রা) বোন যয়নব (রা) খুব ময়লা ও পুরাতন কাপড় পরিহিত অবস্থায় সেখানে পৌঁছলেন এবং এক পাশে গিয়ে নীরবে বসে রইলেন। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করলো, নীরবে এক পাশে বসে আছেন, ইনি কে? যয়নব (রা) কোনই জবাব দিলেন না। কয়েক বার জিজ্ঞাসা করার পরেও যয়নব (রা) চুপ থাকলেন। এরপরে একজন দাসী বললো, ইনি যয়নব বিনতে ফাতিমা (রা)। একথা শুনে ইবনে যিয়াদ বললো, আল্লাহ তা'য়ালার শোকর। যিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, বিনাশ করেছেন এবং তোমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এ কথা শুনে, হযরত যয়নব (রা), উত্তেজিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার শোকর। যিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং আমাদের পবিত্রতার কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। লাঞ্ছিত সেই, যে আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হয়ে চলে। একথা শুনে, ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের ক্রোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের ঔদ্ধত্যকে বিনাস করেছেন। এ কথা শুনে, হযরত যয়নব (রা) কেঁদে দিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমাদের ছোট বড় সকলকে তুমি হত্যা করেছ। আর এই অমানবিক ও জঘন্য কাজকে তুমি তোমার জন্য মুক্তি মনে করছ?

অতঃপর ইবনে যিয়াদ, আলী আসগরের (রা) দিকে ফিরে তাঁর নাম জিজ্ঞসা করলো। বলা হলো, এর নাম আলী। ইবনে যিয়াদ বললো, তাঁকে তো হত্যা করা হয়েছে। তখন আলী আসগর (রা) বললেন, তিনি হলেন আমার বড় ভাই। তাঁর নামও আলী (রা)। ইবনে যিয়াদ তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো। এ সময় আলী আসগর (রা) বললেন, আমাকে হত্যা করা হলে, আমার পরে এই পরিবারের দেখাশুনা কে করবেন? এদিকে তাঁর ফুফু যয়নব (রা) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ইবনে যিয়াদকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে ইবনে যিয়াদ। এখনও তোমার পিপাসা মিটেনি। আমাদের রক্ত আরও পান করতে চাও? আমি তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, যদি একে তোমার হত্যা করতেই হয়, তবে এর সাথে আমাকেও হত্যা

করো। অতঃপর আলী আসগর (রা) ইবনে যিয়াদকে বললেন, হে ইবনে যিয়াদ! আমাকে যদি হত্যা কর, তবে তুমি এই পরিবারের সাথে এমন এক মুত্তাকী ব্যক্তিকে প্রেরণ করবে, তিনি যেন ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। একথা শুনে ইবনে যিয়াদ তার লোকদেরকে বললো যে, এই বালককে ছেড়ে দাও। তিনি নিজেই তাঁর পরিবারের সাথে যাবেন।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ এক নামাযের পর ভাষণ দিলো। সে তার ভাষণে, হযরত হোসাইন ও হযরত আলীকে (রা) গালি-গালাজ করলো। সেই মজলিসে, আবদুল্লাহ বিন আফীফও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। সব সময়ই তিনি মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন; হে ইবনে যিয়াদ। তুমি মিথ্যুকের পুত্র মিথ্যুক। তুমি নবীর আওলাদকে হত্যা করেছ এবং সত্য 'পরায়নদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছ। ইবনে যিয়াদ তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর গোত্রীয় লোকদের কারণে গ্রেফতার করতে পারলো না।

হযরত হোসাইন (রা)-এর পবিত্র শির ইয়াযীদের কাছে প্রেরণ

ইবনে যিয়াদের অন্যায়, অমানবিক ও অশালীন আচরণ এখানেই সমাপ্তি হয়নি, বরং হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শিরকে একটি কাঠের ওপর রেখে কুফা বাজারের সর্বত্র ঘুরানোর জন্য সে তার লোকদেরকে নির্দেশ করলো। যাতে এসব লোকেরা এই শিরকে দেখতে পারে।
অতঃপর ইবনে যিয়াদ হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শির ইয়াযীদের কাছে সিরিয়ায় প্রেরণ করলো। এর সাথে বাকী আহলে বাইতগণকেও প্রেরণ করা হলো। তাঁদের সাথে দেয়া হলো, হর বিন কায়িসকে। সে সিরিয়ায় পৌঁছেই পুরষ্কারের লোভে অতিদ্রুত ইয়যীদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। ইয়াযীদ তাকে দেখে জিজ্ঞাস করলো, কি খবর? হুর কারবালার করুণ কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করে বললো, হে আমীরুল মুমেনীন। আপনার জন্য সু-সংবাদ যে, আমরা বিজয় হয়েছি। বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের শির এবং তাঁদের স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের বাকী লোকদেরকে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি।
কারবালার এই মর্মান্তিক কাহিনী শুনে, ইয়াযীদের দু-চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। সে হুর বিন কায়িসকে বললো, আমিতো তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তাঁদেরকে হত্যা না করে শুধু গ্রেফতার করবে।
আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ সুমাইয়ার পুত্রের ওপর। সে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। খোদার কসম! আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি তাঁদেরকে ক্ষমা-সুন্দরের দৃষ্টিতে দেখতাম। আল্লাহ তা'য়ালা হোসাইনের (রা) ওপর অনুগ্রহ করুন। হুর বিন কায়িসকে ইয়াযীদ কোনই পুরস্কার প্রদান করলো না। হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শির, যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা হলো, তখন ইয়াযীদ তার হাতের ছুড়িটি হযরত হোসাইনের (রা) দাঁতের ওপর লাগিয়ে, হোসাইন বিন হাম্মামের কবিতাটি আবৃত্তি করলো।

الی قومنا أن يتصفو نا فانصت و فواضب في ايما ننا تقطر الدما
يقلقنها ما من رجال اعزة علينا ولهم كانوا اعق والزما

অর্থাৎ: "আমার কওম আমার সাথে ইনসাফ করেনি। অতঃপর আমাদের রক্তপায়ী তরবারী ইনসাফ করেছে। যে তরবারী এমন ব্যক্তির শিরস্ত্বেদ করেছে, যে আমাদের ওপর কঠোর ছিল এবং সু-সম্পর্ক ছিন্নকারী জালিম ছিল।"
এ সময় আবু হারযাহ আসলামী (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইয়াযীদ। তুমি তোমার ছুড়ি হোসাইনের (রা) দাঁতের ওপর লাগাচ্ছ। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁকে চুমু খেতে দেখেছি।
হে ইয়াযীদ। কিয়ামতের দিন তুমি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তোমার সুপারিশকারী ইবনে যিয়াদই হবে। আর হোসাইন (রা) এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে, তাঁর সুপারিশকারী হবেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
এই কথা বলে, আবু হারযাহ (রা) মজলিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াযীদের ঘরে মৃত্যু শোক

ইয়াযীদের স্ত্রী হিন্দা বিনতে আবদুল্লাহ যখন হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের খবর এবং তাঁর কর্তিত শির ইয়াযীদের দরবারে নিয়ে আসার খবর শুনলেন, তখন তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি বাইরে এসে ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার পুত্রের সাথে এরূপ অমানবিক আচরণ করা হয়েছে? ইয়াযীদ বললো, হ্যাঁ। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে নিজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। হিন্দা এই কথা শোনার পরে কেঁদে দিলেন। অতঃপর ইয়াযীদ বললো, হোসাইন (রা) এই মন্তব্য করেছিলেন যে,

"আমার পিতা ইয়াযীদের পিতার চাইতে এবং আমার মাতা ইয়াযীদের মাতার

চাইতে এবং আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়াযীদের নানার চাইতে উত্তম।" তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার কথা হচ্ছে এই যে, আমার পিতা উত্তম না তাঁর পিতা উত্তম, এর ফয়সালা আল্লাহর কাছেই। তিনিই এ ব্যাপারে ভাল

জানেন। তাঁরা উভয়ই আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছেন।

আর দ্বিতীয় মন্তব্যের ব্যাপারে, আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত। তাঁর মাতা,

হযরত ফাতিমা (রা) আমার মাতার চাইতে অবশ্যই উত্তম। তাঁর তৃতীয় মন্তব্যটি এমন একটি সঠিক মন্তব্য, যা কোন মুসলমান যায়

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারে না। হযরত হোসাইনের (রা) উপরক্ত সকল মন্তব্যসমূহ সত্য ও সঠিক। কিন্তু যেই বিপদ তাঁর ওপর এসেছে, তা এসেছে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ার কারণে। তিনি এই আয়াতের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল করেন নি।

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء

"হে নবী আপনি বলুন! হে আল্লাহ, আপনিই রাজাধিরাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব দান করেন। আর যার থেকে ইচ্ছা করেন রজত্ব নিয়ে যান।"

অতঃপর হযরত হোসাইনের (রা) স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদেরকে ইয়াযীদের সামনে নিয়ে আসা হলো এবং সেই মজলিসে হযরত হোসাইনের (রা) শিরও রাখা হয়েছিল। হযরত হোসাইনের দুই কন্যা ফাতিমা (রা) ও সাকীনা (রা) আনত নয়নে তাঁদের শহীদ পিতার শির দেখতে চাইলেন। কিন্তু ইয়াযীদ তাঁদের কর্তিত শির দেখাতে রাজী ছিল না। যখন তাঁদের দৃষ্টি শহীদ পিতার

শিরের প্রতি পড়লো, তখন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই খুব জোরে কেঁদে ফেললেন। তাঁদের ক্রন্দনের করুণ আওয়াজ শুনে ইয়াযীদের ঘরের মহিলারাও চীৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এ সময়, ইয়াযীদের প্রসাদে মৃত্যু শোকের এক ছায়া নেমে এলো।

ইয়াযীদের দরবারে যয়নব (রা)-এর বীরত্ব ব্যঞ্জক বক্তব্য:

ইয়াযীদের দরবারে বসে এক সিরিয়াবাসী হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিল। তখন তাঁর ফুফু হযরত যয়নব (রা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হযরত হোসাইনের (রা) পরিবার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার অধিকার না তোমার আছে, না ইয়াযীদের আছে। একথায়, ইয়াযীদ রুষ্ট হয়ে বললো, সকল অধিকার আমার রয়েছে। যয়নব (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম। যতক্ষন পর্যন্ত তুমি আমাদের এই দ্বীন ও শরীয়ত প্রকাশ্যে ত্যাগ না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করায় কোনই অধিকার তোমার নেই।" এ কথায় ইয়াযীদ আরও রুষ্ট হলো। হযরত যয়নব (রা) ইয়াযীদকে এরপরেও আরও কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। অবশেষে ইয়াযীদ চুপ হয়ে গেলো।

ইয়াযীদের গৃহে আহলে বাইতের মহিলাগণ

অতঃপর ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাগণকে অন্দর মহল্লায় তার ঘরে। মহিলাদের কাছে প্রেরণ করলো। ইয়াযীদের ঘরের সকল মহিলারাই তাদেরকে দেখে ক্রন্দন করলো এবং শোক প্রকাশ করলো। তাদের থেকে, তাঁদের যেসব অলঙ্কারাদি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁর চেয়ে বেশি তাঁদেরকে প্রদান করা হলো।

ইয়াযীদের সামনে আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ)

অতঃপর আলী আসগরকে (রা) হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি অবস্থায় ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হলো। আলী আসগর (রা) ইয়াযীদের সামনে এসে বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় যদি আমাকে দেখতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার বাঁধনগুলো খুলে দিতেন।" ইয়াযীদ বললো, সত্যকথা। এই বলে সে বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল। অতঃপর আলী আসগর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাকে এভাবে মজলিসে বসা থাকা দেখতেন, তবে অবশ্যই তিনি তাঁর কাছে ডেকে নিতেন। এ কথা

শুনে ইয়াযীদ তাঁকে তার কাছে ডেকে নিলো এবং বললো, হে আলী ইবনে হোসাইন (রা)। তোমার পিতাই আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং আমার প্রাপ্য আমাকে দেননি এবং আমার বাদশাহীর বিরোধিতা করেছেন। একারণেই, আল্লাহ তা'য়ালা এরূপ ব্যবস্থা করেছেন, যা তুমি আজ স্বচক্ষে দেখেছ।
এ কথার প্রেক্ষিতে, আলী আসগর (রা) কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে তাকে শুনালেন,

ما اصاب مو مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا في
كتاب من قبل أن تبرأها أن ذالك على الله يسير لكيلا
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل
مختال فخور

অনুবাদঃ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। (সূরা হাদীদঃ ২২-২৩)

ইয়াযীদ এই কথাগুনে চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর সে, আলী আসগর (রা)-কে এবং তাঁর পরিবারের সকল মহিলাদেরকে সতন্ত্র একটি গৃহে রাখার জন্য নির্দেশ দিলো। এরপর থেকে ইয়াযীদ প্রত্যহ নাস্তা ও খানা খাওয়ার সময় আলী বিন হোসাইনকে (রা) কাছে ডেকে নিত। একদিন তাঁর সাথে তাঁর ছোট ভাই আমর বিন হোসাইন (রা) চলে গেলেন। ইয়াযীদ আমর বিন হোসাইনের (রা) সাথে ঠাট্টা করে বললো যে, তুমি আমার এই ছেলে খালিদের সাথে মোকাবিলা করতে পারো? আমর (রা) বললেন, হ্যাঁ পারি। তবে একটি শর্ত এই যে, আপনি তার কাছে একটি চাকু দিবেন আর আমার কাছে একটি চাকু দিবেন। একথা শুনে ইয়াযীদ বলল, "সর্পের বাচ্চা, সর্পই হয়ে থাকে।"
কোন কোন বর্ণনা মতে, ইয়াযীদ প্রথম থেকেই হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ব্যাপারে রাজী ছিল এবং তাঁর পবিত্র শির তার সামনে নিয়ে আসায় খুশীই হয়েছিল। কিন্তু যখন এই জঘন্য ও অমানবিক আচরণে, ইয়াযীদের কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং সে (ইয়াযীদ) সকল মুসলমানদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেলো, তখন অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং বলতে লাগলো যে, হায়। আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে হোসাইনকে (রা) আমার সাথেই আমার গৃহে নিরাপদে রাখতাম। আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতাম। যদিও তিনি আমার অনুসরণকে অপছন্দ করেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এটাই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'য়ালা ইবনে মারজানার ওপর অভিশাপ করুন যে হোসাইনকে (রা) অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। অথচ তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে ইয়াযীদের কাছে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। অথবা কোন এক ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌছিয়ে দেয়া

হোক, যাতে আমি সেখানে পৌঁছে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারি। কিন্তু এই পাপিষ্ঠ নির্বোধ তা শুনেনি। সে তাঁকে হত্যা করে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের কাছে আমাকে ঘৃণিত করেছে। তাঁদের অন্তরে আমার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভাল-মন্দ সকলেই এখন আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। আল্লাহ এই ইবনে মারজানাকে অভিশপ্ত করুন।

আহলে বাইতগণের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইয়াযীদ আহলে বাইতগণকে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলো। সে নোমান বিন বাশীরকে নির্দেশ দিলো যে, তাঁদের মদীনায় যাওয়ার জন্য উত্তম সাওয়ারী প্রস্তুত করো। আর তাঁদের সাথে পথ প্রদর্শক হিসাবে একজন মুত্তাকী। পরহেযগার ব্যক্তিকে দিয়ে দাও এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যও দিয়ে দাও, যারা তাঁদেরকে নিরাপদে মদীনা শরীফে পৌঁছিয়ে দিবে। বিদায়ের মুহূর্তে ইয়াযীদ, আলী বিন হোসাইনকে (রা) তার কাছে ডেকে নিয়ে বললো, আল্লাহ ইবনে
১৩ত অভিশাপ করুন। আল্লাহর কসম, আমি যদি সেখানে (কারবালা থাকতাম, তবে হোসাইন (রা) যা কিছু বলতেন, আমি তা মেনে নিতাম। আর তাঁকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। এতে যদি আমার পুত্রকেও প্রাণ দিতে হতো, তাতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করতাম না। কিন্তু যা ভাগ্যে ছিল তা ঘটে গেছে।

"হে সাহেবজাদা। তোমার যখন যা কিছুর প্রয়োজন হবে, আমাকে পত্রের মাধ্যমে জানাবে। তোমার সাথে যারা মদীনায় যাচ্ছেন, তাঁদেরকেও এই কথা বলে দিয়েছি। "১

অতঃপর আহলে বাইতগণ সৈন্যদের হেফাজতে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। হেফাজতকারীরা পথে বসে আহলে বাইতগণের আন্তরিকভাবে খেদমত করেছেন। রাতের বেলা তাঁদের সাওয়ারীকে অগ্রভাগে রেখেছে। যখন কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, তখন তাঁদেরকে আলাদা স্থান করে দিতেন এবং তাঁদের চারপাশে পাহারা দিতে থাকতেন। প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁদের যখন যা প্রয়োজন হতো, তা যথাযথভাবে আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ করতেন। অবশেষে তাঁরা নিরাপদে ও সম্মানে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মদীনায় পৌছে হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা ফাতিমা (রা) হযরত যয়নবকে (রা) বললেন, এই লোকগুলো আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছে। এদেরকে কিছু উপহার দেয়া উচিত। যয়নব (রা) বললেন, এখন আমার কাছে এই নিজের অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তাঁরা দু'জনই তাঁদের অলঙ্কারাদি হতে দুটি স্বর্ণের কংকন এবং দুটি বাজু তাদের সামনে পেশ করলেন এবং তাঁদের কাছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু যে নেই, সে কথাটিও তাদেরকে বললেন। তারা বললেন, আল্লাহর কসম। আমরা যদি এই কাজ পার্থিব লক্ষ্যে করতাম, তবে এই উপহার আমাদের জন্য কম ছিল না। কিন্তু আমরা আমাদের সেই দায়িত্বই

শুধু পালন করেছি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়ের জন্য আমাদের করণীয় ছিল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্ত্রীর পেরেশানী ও ইন্তেকাল

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্ত্রী রিবান বিনতে এমরুল কায়েসও এই সফরে
তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁকেও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সেখান থেকে তিনি মদীনায় পৌঁছেন। বাকী জীবন তিনি এভাবে কাটিয়েছিলেন যে,
টিকা
১. বিঃ দ্রঃ ইয়াযীদের এই অনুতপ্ততা এবং বাকী আহলে বাইয়াতগণের সাথে সুন্দর আচরণ, এটা কি তার কুখ্যাতি মিটানোর জন্য ছিলো, না প্রভৃত পক্ষে আল্লাহর ভয়ে ছিলো এবং তার অন্তরে পরকালের ভয় সৃষ্টি হয়েছিলো কি না, ত। আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু ইয়াধীদের পরবর্তী কার্যক্রম গুলো অতান্ত কলঙ্কময় ছিলো। শেষ মুহূর্তেও সে মক্কা শরীফ আক্রমণের জন্য সৈনা প্রেরণ করেছিলো। আর এই অবস্থায়ই সে মারা যায়। তার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ আ'লাই খুন অবহিত।
কখনই তিনি ঘর থেকে বের হতেন না। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য কেউ প্রস্তাব দিলে বলতেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আর অন্য কাউকে শ্বশুর হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নই। এর এক বছর পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শাহাদতের খবর মদীনায় পৌঁছলে, গোটা মদীনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মদীনার সর্বত্র কান্নার রোল পড়ে যায়। সকলেই স্তিমিত ও পেরেশান হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন হযরত হোসাইনের (রা) বাকী পরিবার-পরিজন মদীনায় পৌছেন, তখন ব্যথিত, দুঃখিত ও মর্মাহত
মদীনাবাসীদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

আবদুল্লাহ বিন জাফরকে সমবেদনা জ্ঞাপন

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফরের (রা) দুই পুত্র এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁদের শাহাদতের খবর শুনে বহু লোক হযরত আবদুল্লাহ বিন আফরকে (রা) সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এক ব্যক্তি বলে ফেললেন যে, হযরত হোসাইনের (রা) কারণেই আমাদের ওপর এই মসিবত এসেছে। একথা শুনে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তার দিকে জুতা নিক্ষেপ করে বললেন, আহম্মক! তুমি কি কথা বলছ? আল্লাহর কসম! যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে হযরত

হোসাইনের সাথে আমিও নিহত হতাম। আল্লাহর কসম! আজ আমার সন্তানদের শাহাদতই আমাকে প্রশান্তি দিচ্ছে যে, আমি যদিও হযরত হোসাইনের (রা) কোন সাহায্য করতে পারিনি, কিন্তু আমার সন্তানগণতো এই কাজটি করেছেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতে প্রকৃতির পরিবর্তন

ইবনে আমীরের বর্ণনা মতে, হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের পর থেকে দুই তিন মাস পর্যন্ত প্রকৃতির এই অবস্থা হয়েছিল যে, যখন সূর্যাস্ত যেত এবং সূর্যের কিরণ দরজা ও প্রাচীরে এসে পড়ত, তখন সূর্যের আলোটা এত লাল বর্ণের হতো, মনে হতো যেন প্রাচীর ও দরজাটি রক্ত দিয়ে প্রলেপ করা হয়েছে।

শাহাদতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্নে দেখা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন যে, দ্বিপ্রহরের সময়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং পেরেশান। তাঁর পবিত্র হাতে একটি শিশি। যার মধ্যে ছিল রক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এর মধ্যে কি? তিনি বললেন, হোসাইনের (রা) রক্ত। আমি এ রক্ত আস্থান তা'য়ালার সামনে পেশ করবো। হযরত আব্বাস (রা) এই স্বপ্নটি দেখার পরেই, লোকদের কাছে বললেন যে, হযরত হোসাইন (রা) শহীদ হয়ে গেছেন। এই স্বপ্নের চৌদ্দ দিন পরেই, তাঁর শাহাদতের খবর এসে পৌছল। হিসাব করে দেখা গেলো যে, যেদিন হযরত আব্বাস (রা) স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেইদিনেই সেই সময়ই হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন। (বায়হাকী)

সালমী (রা) বলেন, একদিন আমি উম্মে সালমার (বা) কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি খুব কাঁদছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলদেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে স্বপ্নে দেখলাম যে, তাঁর পবিত্র মাথায় এবং দাড়ি মুবারকে ধুলো পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি অবস্থা? তিনি বললেন, আমি এখন হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ওখানে উপস্থিত ছিলাম। (তিরমিযী) হযরত উম্মে সালমা (বা) থেকে আবু নারীম কর্তৃক এভাবে বর্ণিত আছে যে,

হফার হোসাইনের (রা) শাহাদতে আমি জন্নাতকে ক্রন্দন করতে দেখেছি। (পালায়েল)

হযরত হোসাইন (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদ্য

হযরত হোসাইন (রা) হিজরী চতুর্থ সনের এই শ্যবান মদিনা শরীফে ভূমিষ্ঠ হন এবং হিজর ১১ সনের ১০ই মুহাররম ৫৫ বসর বয়সে শাহাদত বরণ করেন।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর 'তাহনীক' নিজ হস্ত মুবারকে করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি খেজুর চিবিয়ে ভার রস হযরত হোসাইনের (রা) মুখে নিজ হাতে নিয়েছেন এবং তাঁর কর্ণে তিনি আযানও দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর নাম হুসাইন রাখেন। সপ্তম দিবসে তাঁর আকীকা করা হয়। হযরত হোসাইন (রা) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভয় ছিলেন।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বলেন-

حسن منى وانا من حسين

"হোসাইন (রা) আমার থেকে। আর আমি হোসাইন (রা) থেকে ।اللهم أحب حسين " আল্লাহ। যে হোসাইনকে (রা(ভালবাসে, তাকে আপনি ভালবাসুন।"

হযরত জাবের বিন আবনুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন-

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنه وفي لفظ شيد شباب
اهل الجنة وفي لفظ شيد شباب اهل الجنة فلينظر إلى حسين
بن على .

"জান্নাতবাসীদের মধ্যে ননি কাউকে দেখতে চাও, অথবা এই কথা বলেছিলেন যে, জান্নাতী যুবকদের সঙ্গারকে যদি দেখতে চাও, তবে হোসাইন বিন আলীকে (রা) দেখে নাও

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে তাশরীফ রেখে বললেন, সেই ছেলেটি কোথায়? অর্থাৎ হোসাইন (রা)। এ সময় হোসাইন (রা) এসে তাঁর কোলে বসে পড়লেন এবং তাঁর দাড়ি মুবারকে আঙ্গুলি প্রবেশ করাতে লাগলেন। তিনি হোসাইনের (রা) মুখে চুমু দিলেন এবং বললেন, আমি হোসাইনকে (রা) ভালবাসি। আর হোসাইনকে (রা) যে ভালবাসে তাকেও আমি ভালবাসি।
একবার ইবনে ওমর (রা) কাবার চত্বরে বসাচ্ছিলেন। তখন তিনি হযরত

হোসাইনকে (বা) আসতে দেখে বললেন, "এই ব্যক্তি বর্তমানে, (অর্থাৎ এই সময় কালে) আকাশবাসীদের কাছে, পৃথিবীর মধ্যে অধিক প্রিয় ও পছন্দের ব্যক্তি।" হযরত হোসাইন (রা) অত্যন্ত দানশীল ও অসহায় লোকদের সাহায্যকারী "

ছিলেন। তাঁর জান ও মাল মানব কল্যাণে উৎসাহিত ছিল। তিনি বলতেন, আল্লাহর জন্য কারো অভাব পূরণ করা, এক মাসের ইতেকাফের চেয়ে উত্তম।"

হযরত হোসাইন (রা)-এর অমূল্য উপদেশ:

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর অনুসারীগণকে সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, কোন মানুষ যদি কোন প্রয়োজনে তোমার কাছে আসে, তখন তুমি তাতে বিরক্ত হয়ো না। কারণ, তোমার কাছে ভাব প্রয়োজন (অভাব) নিয়ে আসাটা তোমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আর যদি তুমি এতে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হও, তবে এই অনুগ্রহ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাকে লোকের প্রতি মুখাপেক্ষী করানো হবে। তুমি তখন তাদের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে। হযরত হোসাইন (রা) একদিন মক্কার হরম শরীফে "হাজরে আসওয়াদ ধরে এই দোয়া করতে ছিলেন, "হে আল্লাহ। আপনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু আমাকে কৃতজ্ঞকারী হিসাবে পাননি। আমাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু আমাকে ধৈর্য্যশীল হিসাবে পাননি। এরপরেও আপনি আপনার অনুগ্রহ আমার থেকে সরিয়ে নেননি এবং আমাকে বিপদের সম্মুখীনও করেননি। হে আল্লাহ! আপনি মহ্য অনুগ্রহশীল। আর অনুগ্রহশীল থেকেইতো অনুগ্রহ হয়ে থাকে।"

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর পিতা হযরত আলীর (রা) সাথে কুফায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ সময় হোসাইন (রা) তাঁর পিতার সান্নিধ্যেই ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করার পরে, হোসাইন (ক), তাঁর ভাই হযরত হাসানের (বা) সাথে থাকেন। হযরত হাসান (রা) কৃষ্ণা ত্যাগ। করে যখন মদীনায় চলে আসেন, তখন হযদাত হোসাইনও (রা) তাঁর সাথে মদীনায় আসেন। ইয়াযীদের বাইয়াতের ফিচন শুরু হওয়র পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। হবারত হোসাইনের (রা) সাথে কারবালা প্রান্তরে তেত্রিশজন আহলে বাইত শাহাদত বরণ করেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের বিভীষিকাময় পরিণাম

হযরত হোসাইন (রা) যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে এক ফোটা পানি সংগ্রহের জন্য ফোরাত নদীর কাছে গিয়েছিলেন তখন পাপিষ্ঠ হোসাইন বিন নোমায়ের তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। যা তাঁর পবিত্র মুখের ওপর গিয়ে লেগেছিল। এ সময় হযরত হোসাইনের (রা) যবান থেকে স্বাভাবিক

ভাবেই তার জন্য বদ দোয়া বেরিয়ে আসলো যে, "হে আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার পুত্রের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে, আমি এর অভিযোগ আপনার কাছেই পেশ করলাম। হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে খন্ড-বিখন্ড করে দিন। তাদের কাউকেই বাকী রাখবেন না।"

একে তো মজলুমের বদ-দোয়া, এরপরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওলাদ, এই বদ-দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। দোয়া কুবল হয়ে গেলো। পরকালের শাস্তির পূর্বেই এই পৃথিবীতেই তারা (হত্যাকারীরা) এক এক করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

ইমাম যহরী (রা) বলেন, যারা হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল তারা সকলেই পরকালের শাস্তির পূর্বে, এই পার্থিব জীবনে ভীষণ শাস্তি ভোগ করে নিহত হয়েছে। কারো কারো মুখমণ্ডল কালো কুৎসিত হয়ে গিয়েছিল কারো কারো চেহারা একেবারে সমান হয়ে গিয়োছিল। তাদেরকে চেনার কোন উপায় হিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তারা রাজ্যচুত হয়েছে। এই পার্থিব শাস্তিই তাদের কু-কর্মের আসল শাস্তি নয়, বরং এটা ছিল পরকালীন মহাশাস্তির একটি নমুনা। যা মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পৃথিবীতে দেখানো হয়েছিল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীর অন্ধ হওয়া

সাবত ইবনে জাওযী (র) বলেন, এক বৃদ্ধলোক হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল। সে অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে গেলো। লোকেরা তার কাছে এরূপ অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাবে সে বললো, আমি বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে একখান। তরবারী এবং তাঁর সামনে চামড়ার একটি বিছানা। সেই বিছানার ওপর হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের মধ্য হতে দশ ব্যক্তির লাশ যবেহ করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অতঃপর তিনি (রা) আমাকে খুব ধমক দিলেন এবং হোসাইনের (রা) রক্ত মাখ। একটি শলাকা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন। আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে দেখি, আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

মুখ কালো হয়ে যাওয়া

ইবনে জাওযী (র) বর্ণনা করেছেন, যে লোকটি হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শিরকে তার নিজ ঘোড়ার গর্দানে লটকিয়ে রেখেছিল, পরবর্তীতে দেখা গেলো যে, তার মুখ কালো কুৎসিত হয়ে গেছে। লোকেরা এর কারণ তার কাছে জিজ্ঞাস করলো যে, হে ভাই। গোটা আরবের মধ্যে তোমার চেহারা ছিল অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এখন এরূপ কালো হয়ে যাওয়ার কারণ কি? সে বললো, যেদিন থেকে আমি হোসাইনের (রা) শির আমার ঘোড়ার গর্দানে লটকিয়েছি, সে দিন থেকেই, যখনই আমি একটু নিদ্রায় যেতাম তখনই দু'ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে আমাকে এক প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে নিয়ে যেতো এবং তার মধ্যে নিক্ষেপ করত। এতে আমার চেহারা ঝলসে গিয়েছে। কিছু দিন পরে এই লোকটি এই অবস্থায়ই মারা যায়

আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া

ইবনে জাওযী, সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন। সেই দাওয়াতী মজলিসে এই আলোচনা হচ্ছিল যে, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় যারা শরীক ছিল তারা পৃথিবীতে অতিদ্রুত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তখন সেই দাওয়াতী ব্যক্তি বললো এই কথা আদৌ সত্য নয়। আমি নিজেই এই হত্যায় শরীক ছিলাম। আমার তো কিছুই হয় নি। এইবলে সেই ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে তার ঘরে চলে গেলো। ঘরে পৌঁছে ঘরের জ্বালানো প্রদীপটি ঠিক করতে গিয়েই অকস্মাৎ তার কাপড়ে আগুন লেগে গিয়ে সে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। সুদ্দী বলেন, আমি নিজে তাকে সকাল বেলা দেখেছি যে, সে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে।

পানি পানে বাধা প্রদানকারীর করুণ মৃত্যু

যে ব্যক্তি হযরত হোসাইনের (রা) ওপর তীর নিক্ষেপ করেছিল এবং পানি পানে বাধা দিয়েছিল, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা এমন তৃষ্ণার্ত করেছিলেন যে, সে যতই পানি পান করত, কিন্তু কোন ভাবেই সে তৃষ্ণা মিটাতে পারত না। তৃষ্ণায় সে ছটফট করত। শেষ পর্যন্ত পেট ফেটে গিয়ে করুণ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে।

ইয়াযীদের লাঞ্ছনাময় মৃত্যু

হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের পর থেকে, ইয়াযীদ একদিনের জন্যও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেনি। গোটা রাজ্যে হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শাহাদতের প্রতিশোধের জন্য বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ইয়াযীদের এই পার্থিব জীবনের অস্থায়ী ও কলংকময় নেতৃত্ব, হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের পর থেকে দু'বছর আট মাস, মতান্তরে তিন বসর আট মাসের বেশি থাকেনি। ।এই পৃথিবীতেও আল্লাহ তা'য়ালা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন এবং এই লাঞ্ছিত অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করেছে।

কুফায় মুখতারের কর্তৃত্ব এবং হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের করুণ মৃত্যু

হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীরা, আকাশ ও পৃথিবীর বিপদে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হতে লাগলো। কারবালার শাহাদতের পাঁচ বছর পরেই হিজরী ৬৬ সনে, মুখতার, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের থেকে কিসাস (হত্যার বিনিময়) নেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে সাধারণ মুসলমানগণ তার সাথে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মুখতার এতখানি শক্তি অর্জন করলেন যে, কুফা ও ইরাকে তার কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গেলো। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, হোসাইনের (রা) হত্যকারীদের ব্যতীত অন্য সকলকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। আর হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে বহু লোক লাগিয়ে দিলেন। তিনি এক একজনকে গ্রেফতার করে হত্যা করলেন। একদিনেই দুইশত আট চল্লিশ ব্যক্তিকে এই অপরাধে হত্যা করা হলো। তারা হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল। এর পরে বিশেষ অপরাধীদেরকে

খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা শুরু হলো। আমর বিন হুজ্জাজ যোবায়দী তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পালিয়ে যেতে শুরু করলো। ভীষণ তৃষ্ণার্ত থাকার কারণে অচেতন হয়ে পড়ে গেলো। তাকে সেই অবস্থায়ই

যবেহ করা হলো। হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অপরাধ ও অন্যায় করেছিল শিমর। তাকে হত্যা করে তার লাশ কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করে দেয়া হলো।

আবদুল্লাহ বিন উসায়দ জিহনী, মালিক বিন বাশীর এবং হামল বিন মালিককে গ্রেফতার করা হলো। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তারা নিজেরা

আবেদন করল। মুখতার বললেন, হে জালিমেরা। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্রের প্রতি অনুগ্রহ করনি। এখন তোমাদের প্রতি কিভাবে অনুগ্রহ করা যায়? অতঃপর সকলকে হত্যা করা হলো। মালিক বিন বাশীর হযরত হোসাইনের (রা) টুপি মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিল। এ কারণে,

তার দুই হাত ও দুই পা কর্তন করে, তাকে ময়দানে ফেলে রাখা হয়েছিলো। অবশেষে সে ছটফট করতে করতে মারা গেল। ওসমান বিন খালিদ এবং বাশর বিন শোমায়েত, মুসলিম বিন আকীলের

(রা) হত্যায় সহায়তা করেছিল। তাদের দু'জনকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আমার বিন সাদ, যে হযরত হোসাইনের (রা) মোকাবিলায় সৈন্য পরিচালনা করেছিল, অকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে নিয়ে আসা

হলো। মুখতার, আমরের পুত্র হাফষকে পূর্ব থেকেই তাঁর দরবারে ডেকে এসে বসিয়ে রেখেছিলেন। যখন আমরের কর্তিত মাথা দরবারে নিয়ে আসা হলো, তখন মুখতার হাফযকে (রা) বললেন, তুমি কি জান, এই মাথাটি কার? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জানি। অতঃপর তাকেও হত্যা করা হলো। মুখতার বললেন, আমর বিন সাদকে হত্যা করা হয়েছে, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার বিনিময়ে। আর হাফযকে হত্যা করা হলো, আলী বিন হোসাইনের (রা) হত্যার বিনিময়ে। এর পরেও এই বিনিময় যথাযথ হয়নি। আমি যদি চারভাগের তিন ভাগ কুরায়শকে, হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের বিনিময়ে হত্যা করে ফেলি, এরপরেও হযরত হোসাইনের (রা) একটি অঙ্গুলিরও প্রতিশোধ আদায় হয় না। হাকিম বিন তোফায়েল, যে হযরত হোসাইনকে (রা) তীর মেরেছিল, তার

শরীর তীর দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়া হলো। এতেই সে মারা গেছে। যায়েদ

বিন রিফাদ, হযরত হোসাইনের (রা) ভাতিজা মুসলিম বিন আকীলের (রা) পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) তীর মেরেছিল। তাকে গ্রেফতার করে প্রথমে তার ওপর তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর জীবিক অবস্থায় তাকে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সিনান বিন আনাস, যে হযরত হোসাইনের, (রা) পবিত্র শির কর্তনের

ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, সে কুফা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তার ঘর বিধ্বস্ত করে দেয়া হলো।

হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের এই বিভীষিকাময় ও করুণ পরিণামের ঘটনা শুনে, স্বাভাবিকভাবে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ যবানে এসে যায়।

كذالك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولوكانوا يعلمون

"শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি এর চেয়ে ভীষণ। কতই না ভালো হতো। যদি তারা জানতো।

অমঙ্গল ও জঘন্য প্রাসাদ

আবদুল মালিক বিন ওমায়ের লাইসী বলেন যে, আমি কুফার রাজপ্রাসাদে, আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে হযরত হোসাইনের (রা) কর্তিত শির, একটি ঢালের ওপর রক্ষিত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর সেই প্রাসাদেই আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের কর্তিত শির, মুখতারের সামনে দেখেছি। এর পরে সেই প্রাসাদেই মুখতারের কর্তিত শির, মাসআব বিন যোবায়েরের সামনে দেখেছি। অতঃপর সেই স্থানেই মাসআব বিন যোবায়েরের শির আবদুল মালিকের সামনে দেখেছি। আমি এই ঘটনা, আবদুল মালিকের কাছে পেশ করলাম। তিনি এই প্রাসাদকে অমঙ্গল ও জঘন্য মনে করে এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। (তারীখে খোলাফা)

হযরত আবু হোরায়রা (রা) সম্ভবত এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি শেষ বয়সে এই দোয়া করেছিলেন যে, "হে আল্লাহা আমি ষাটবছর এবং নবাগতদের নেতৃত্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাঁ বছরের সময়ই ইয়াযীদের নেতৃত্ব শুরু হয় এবং ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। আলিম বেশি হলে, মাজলুমকে শারীরিক ভাবে ভীষণ নির্যাতন করতে পারে। এর বেশি আর নয়। কোন কবি বলেছেন,

پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد !برگردن دے بماند و برما بگذشت

ভাবার্থঃ "জালিম অপরের উপর যে জুলুম করে, তা অবশ্যই বুঝে। কিন্তু এই জুলুম যে তার উপর প্রবর্তিত হবে তা বুঝে না।"

জালিমরা, যাদের ওপর নির্যাতন করেছে, যাদেরকে পৃথিবী থেকে বিনাশ করতে চেয়েছে, তারা (অত্যাচারিতগণ) প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। প্রতিটি ঘরে ঘরে তাঁদের সম্পর্কে উত্তম আলোচনা হয়ে থাকে। হাজার হাজার বছর অতিবাহিও হয়ে গেছে, মানুষ এখনও তাঁদের জন্য নিবেদিত এবং তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকেন। ঘটনায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয়ে থাকে। এই কারবালার ঘটনায়, সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ করে, যারা নেতৃত্বের নেশায় লিপ্ত হয়ে, জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি আদৌ

খেয়াল রাখে না, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট এক শিক্ষা ও উপদেশ।

জ্ঞানীগণ উপদেশ

সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে কখনো সত্যের আওয়াজ নির্বাপিত হয়ে যায় এবং সত্যপন্থীরা পরাজিত হয়। এতে অসত্য সত্য হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। অসত্য অসত্যই থেকে যায়। আর সত্য সর্বাবস্থায়ই সত্য থেকে যায়। দেখবে, পরিণামে কি দাঁড়ায় । পরিগামে, সত্যপন্থীরাই পুনরায় অত্যন্ত আঁকা জাঁকজমকের সাথে বিজয় লাভ করে থাকে।

হযরত হোসাইন (রা)-এর আদর্শ

যে কথা দিয়ে এ কিতান লেখা শুরু করেছি, সেদিকেই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করছি। 'আহলে বাইয়াতের' প্রতি মহব্বত রাখাও ঈমানের অংশ। হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের, নিষ্ঠুর ও আমানবিক শাহাদতের ঘটনায়, যার অন্তর বাম্বিত ও দুঃখিত হবে না, সে মুসলমান ভো দূরের কথা সে মানুষই নয়। তাঁদেরকে ভালবাসা এবং তাঁদের মসিবতে ব্যথিত হওয়ার অর্থ এই নহে যে সারা বছর আনন্দ উল্লাসে কাটিয়ে শুধু দশই মুহাররম শাহাদতের ঘটনাকে স্মরণ করে, আহজারী করবো, অথবা শোক প্রকাশ করে বড় ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো। আর তাঁদের প্রতি ভালাসার অর্থ এটাও নয় যে, সারা বছর

বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালে, কাউকেই পানি পান না করিয়ে শুধু মহরমের তারিখে, বর্ষাকাল বা শীতকাল হলেও, লোকদেরকে পানি পানের প্রয়োজন না হলেও, কারবালার শহীদগণের পানি পান করাবো। বরং প্রকৃত ভালবাসা ও সমবেদনা হচ্ছে এই যে, যেই মহান উদ্দেশ্যে, হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছেন, সেই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী নিজকে কুরবানী করা। তাঁর চরিত্র ও আমলের অনুসরণ করাকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের জন্য খোশ নসীব মনে করা। তাঁর মহান উদ্দেশ্যগুলো যদি, এই পুস্তক থেকে কেউ একাগ্রতার সাথে পড়ে থাকেন, তবে তার অনুসরণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকবে না। খরণ রাখার জন্য, পুনরায় আমি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি।

যে উদ্দেশ্যে হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছেন

পূর্বের আলোচনায়, হযরত হোসাইনের (রা) বসরাবাসীর নামে প্রদত্ত পত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা পাঠকগণ! আপনারা পড়েছেন। সেই পত্রের কিছু অংশ আমি পুনরায় পেশ করছি। "আপনরা দেখছেন যে, বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত
মিটে বাচ্ছে এবং বিদয়াত ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আপনাদেরকে এই আহ্বান জানাচ্ছি যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলুল্লাহর হিফাজত করুন এবং এর বিধান প্রচারের জন্য চেষ্টা করুন।" কবি ফরমলকের জবাবে, যেই কথা তিনি কুফার রাস্তায় বসে বলেছিলেন, সে
কথাও এ পুস্তকের পূর্ববর্তী আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তার কিছু গৰা এই যে, "আল্লাহর ইচ্ছ ইচ্ছা যদি আমার ইচ্ছার অনুকূলে হয়, তবে আল্লাহর শোকর আদায় করবো। আর এই শোকর আদায়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওফিক কামনা করবো। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা আমার ইচ্ছার অনুকূলে না হয়, তবে এতে সেই ব্যক্তির কোনই অপরাধ নেই, যার নিয়ত শুক্ত এবং যার অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে।" (ইধনে আগীর)

হযরত হোসাইন (রা) যুদ্ধের ময়দানে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, সে ভাষণটিও খুব একাগ্রতার সাথে পাঠ করে দেখুন, যাতে আলিম ও অন্যায়কারীদের মোকাবিলায় শুধু আল্লাহর জন্যই তাঁর স্থির থাকার কথা প্রকাশ। পেয়েছে। যুদ্ধের ময়দানের তৃতীয় ভাষণে এবং এরপরে দুর বিন ইয়াগীদের এ জবাবে, তিনি এক সাহাবীর কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন। যায় কিছু কন্য এই যে, "মৃত্যু কোন যুবকের জন্য খারাপ নায়, যখন তার নিয়ত। উদ্দেশ্যে। সৎ থাকে এবং মুসলমান অবস্থায় যুদ্ধ করে প্রচন্ড যুদ্ধের সময়, হযরত হোসাইনের (রা) স্বপ্নের কথা শুনে, তাঁর সাহেবজাদা আলী আকবরের (রা) এই কথা বলা যে, "আব্বাজান! আমরা কি সত্যের ওপর নই?" তিনি বললেন "সেই মহান সত্তার শপথ! যার কাছে সকল বান্দার প্রত্যাবর্তন করতে হবে, নিশ্চয়ই আমরা সত্যের ওপর রয়েছি।"

আহলে বাইতের সামনে হযরত হোসাইনের (রা) শেষ কথাগুলো পুনঃরায় পাঠকের সামনে পেশ করছি।

"আমি আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করি, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই। হে আল্লাহ! আমি আপনার শোকর আদায় করছি, আপনি মেহেরবানী করে, আমাকে কর্ণ ও অন্তর দান করেছেন, যা দ্বারা আমি আপনার আয়াত বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আর আপনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং দ্বীনের বুঝ দান করেছেন। আপনি আমাকে আপনার কৃতজ্ঞশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

এই ভাষণ শোনার পরেও, কোন মুসলমানের কি এই সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত হোসাইনের (রা) এই জিহাদ ও বিস্ময়কর কুরবানী ছিল রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের জন্য?

তারা বড়ই জালিম, যারা এই সম্মানিত ও বুযুর্গ ব্যক্তির কুরবানী সম্পর্কে এই কথা বলে থাকে যে, এটি ছিল পার্থিব সম্মান ও নেতৃত্বের জন্য।

উপসংহার

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, কারবালার ইতিহাসে হযরত হোসাইনের (রা) জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে-১. কিতাব ও সুন্নাহর বিধান যথাযথভাবে চালু করা। ২. ইসলামী ইনসাফ সর্বত্র কায়েম করা। ৩. ইসলামে, খেলাফতে নুবওয়াতের পরিবর্তে বাদশাহী ও আমিরী শাসনের মোকাবিলা করা। ৪. সত্যের মোকাবিলায় কোন শক্তির সামনে ভীত না হওয়া। ৫. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় প্রাণ, সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ প্রতিবন্ধক না হওয়া। ৬. সকল বিপদ-আপদে ও কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁর ওপরই ভরসা করা। ৭. কঠিন বিপদেও আল্লাহ তা'য়ালার শোকর করা। এমন কেউ আছে কি? যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হোসাইনের (রা) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক ভাবে প্রস্তুত এবং তাঁর আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর?

"হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনার ও আপনার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর সাহাবা ও আহলে বাইতগণের পুরোপুরি অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।" আমীন।

গ্রন্থপুন্জি

১)বই- ইমাম হুসাইনের (রা:) শাহাদাত, লেখক- আকরাম ফারুক, আহসান পাবলিকোশন, প্রকাশকাল, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০০, তৃতীয় প্রকাশ আগস্ট, ২০১৪

২)বই-শহীদে কারবালা, লেখক- মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), অনুবাদক- মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী,
ছারছীনা প্রকাশনী -ঢাকা

৩)প্রবন্ধ-কারবালায় কি ঘটেছিলো? রচনা - শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী, প্রকাশনায়- তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ২০১২